প্রকাশক :
ডি, সি, ভট্টাচার্য্য
বাতায়ন পাবলিশিং হাউস
৮৫, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

দাম : পাঁচ সিকা

মানসপয়লা প্রেস
১১৪।১এ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে
শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত

মুখপত্র

মাসখানেক পূর্ব্বে ঘোষালের বেনামিতে আমার লেখা—"বীণাবাই" নামক গল্পের প্রশংসা সূত্রে বাতায়ন পত্রিকায় যে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়, তার অন্তরে উক্ত প্রবন্ধের লেখক একটি প্রস্তাব করেন। তিনি বলেন, ঘোষালের গল্পগুলি একত্র করে পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করা উচিত।

সেই প্রস্তাব অনুসারে আমি বাতায়ন-সম্পাদক শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র ঘোষালকে উক্ত গল্প তিনটি পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করবার অনুমতি দিয়েছি।

ঘোষালের গল্প এক শ্রেণীর পাঠকের অত্যন্ত প্রিয়। "ফরমায়েসি গল্প" নামক প্রথম গল্পটি প্রায় বিশ বৎসর পূর্ব্বে সবুজ-পত্রে প্রকাশিত হয়েছিল, পরে আহুতি নামক গল্প সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

"ঘোষালের হেঁয়ালী" নামক দ্বিতীয় গল্পটি বছর দুয়েক আগে বিচিত্রা পত্রিকায় প্রকাশিত আর তৃতীয় গল্প "বীণাবাই" দুমাস আগে ভারতবর্ষে প্রকাশিত হয়েছে।

আশাকরি 'ঘোষালের ত্রিকথা'—পাঠকদের মনোরঞ্জন করবে।

২৮।৯।৩৭

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

উৎসর্গ

শ্রীযুক্ত সোমনাথ মৈত্র

করকমলেষু

ঘোষালের গল্পের তুমি একজন বিশেষ গুণগ্রাহী। তাই—"ঘোষালের ত্রিকথা" আমার প্রীতির চিহ্ন স্বরূপ তোমার করে সমর্পণ করছি।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

৩০।৯।৩৭

ঘোষালের ত্রিকথা

কারণ, গোস্বামী মহাশয়ের বর্ণ ছিল, উজ্জ্বল নয়—ঘোরশ্যাম; আর এক কারণ, তিনি কথায় কথায় উজ্জ্বল-নীলমণির দোহাই দিতেন। এই নামকরণের পর সে রোগ তাঁর সেরে গিয়েছিল।

জমিদার মহাশয়ের প্রশ্নের উত্তরে গোঁসাইজি বললেন—আজ্ঞে, ইংরাজিনবীশদের যে মতিগতি ফিরছে তা আমি জেনে শুনেই বলছি। আমারই জনকত পাসকরা শিষ্য আছে, যাদের কাছে ঘোষাল যদি ও গানটা না গেয়ে গান ধরত

গেলি কামিনী গজবরগামিনী
বিহসি পালটী নেহারি

তাহলে আমি হলপ করে বলতে পারি তারা ভাবে বিভোর হয়ে যেত।

—ও দুয়ের তফাৎটা কোথায়?

—তফাৎটা কোথায়?—বললেন ভাল পণ্ডিত মশায়! একটা টপ্পা আর একটা কীর্তন!

—অর্থাৎ তফাৎ যা তা নামে!

—অবাক করলেন! তাহলে শোরীমিয়ার সঙ্গে বিদ্যাপতি ঠাকুরের প্রভেদও শুধু নামে। নামের ভেদেই ত বস্তুর ভেদ হয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে আসল প্রভেদ রসে। যাক, আপনার সঙ্গে রসের বিচার করা বৃথা। রসজ্ঞান ত আর টোলে জন্মায় না।

—বটে! অমরু শতক থেকে সুরু করে নৈষধের অষ্টাদশ সর্গ পর্যন্ত আলোচনা করে যদি রসজ্ঞান না জন্মায়, তাহলে মনু

থেকে সুরু করে রঘুনন্দনের অষ্টাদশ তত্ত্ব [illegible] ধর্ম্মজ্ঞান জন্মায় না।

—রাগ করবেন না পণ্ডিত মশায়, কিন্তু কথাটা এই যে, সংস্কৃতকাব্যের রস আর পদাবলীর রস এক বস্তু নয়—ও দুয়ের আকাশ পাতাল প্রভেদ।

—আপনি ত দেখছি এক কথারই বার বার পুনরুক্তি করছেন। মানভূম টপ্পা ও কীর্ত্তন এক বস্তু নয়, কাব্যরস ও পদাবলীর রস এক বস্তু নয়। কিন্তু পার্থক্য যে কোথায়, তা ত আপনি দেখিয়ে দিতে পারছেন না।

—তফাৎ আছে বৈকি। যেমন তালের রস ও তাড়ি একবস্তু নয়—একটায় নেশা হয়, আর একটায় হয় না। সংস্কৃত কবিতা পড়ে কেউ কখন ধূলোয় গড়াগড়ি দেয়?

ঘোষালের এ মন্তব্য শুনে রায় স্মৃতিরত্ন সভাশুদ্ধ লোক হেসে উঠল। উজ্জ্বল-নীলমণি মহাক্রুদ্ধ হয়ে বললেন—

পণ্ডিত মহাশয়, আপনিও এই সব ইয়ারকি[illegible] প্রশ্রয় দেন? আশ্চর্য্য! যেমন ঘোষালের বিদ্যে তেমনি তার বুদ্ধি।

রায় মহাশয় ঘোষালকে চব্বিশঘণ্টা ধমকের উপরেই রাখতেন; কিন্তু তার বিরুদ্ধে অপর কাউকেও একটি কথা বলতে দিতেন না। আমার পাঁঠা আমি লেজের দিকে কাটব, কিন্তু অপর কাউকে মুড়ির দিকেও কাটতে দেব না"—এই ছিল তাঁর motto. তিনি তাই একটু গরম হয়ে বললেন—

—কেন, ওর বুদ্ধির কমতিটে দেখলে কোথায় হে উজ্জ্বল-

নীলমণি। তোমাদের মত ওর পেটে বিদ্যে না থাকতে পারে, কিন্তু মগজে ঢের বেশি বুদ্ধি আছে। আলঙ্কারিক এমনি একটি জুতসই উপমা লাগাও ত দেখি!

—আজ্ঞে, ওর বুদ্ধি থাকতে পারে কিন্তু রসজ্ঞান নেই।

—রসজ্ঞান ওর নেই, আর তোমার আছে? করো ত এমনি একটা রসিকতা!

—আজ্ঞে ঐ রসিকতাই প্রমাণ, ওর মনে ভক্তির নামগন্ধও নেই। যার ধর্ম্মজ্ঞান নেই, তার আবার রসজ্ঞান!

স্মৃতিরত্ন এ কথা শুনে আর চুপ থাকতে পারলেন না। বল্লেন—

—এ আবার কি অদ্ভুত কথা! গোঁসাইদের ধর্ম্মজ্ঞান না থাকতে পারে, তাই বলে কি ওর রসজ্ঞান থাকতে নেই?

—অবশ্য না! ও দুইত আর পৃথক জ্ঞান নয়।

—আমাদের কাছে যা সামান্য, আপনার কাছে যখন তা বিশেষ, আমাদের কাছে যা বিশেষ আপনার কাছে তা অবশ্য সামান্য; এ এক নব্যন্যায় বটে!

—শুনুন পণ্ডিত ম'শায়। যার নাম রসজ্ঞান তারি নাম ধর্ম্মজ্ঞান; আর যার নাম ধর্ম্মজ্ঞান তারি নাম রসজ্ঞান। নামের প্রভেদে ত আর বস্তুর প্রভেদ হয় না।

—বলেন কি গোঁসাইজি! তাহলে আপনাদের মতে, যার নাম কাম তারি নাম ধর্ম্ম, আর যার নাম অর্থ তারি নাম মোক্ষ?

—আসলে ও সবই এক। রূপান্তরে শুধু নামান্তর হয়েছে।

ঘোষালের ত্রিকথা

—বুঝছেন না পণ্ডিত মহাশয়, কথা খুব সোজা। গোঁসাইজি বলছেন কি যে, যার নাম ভাজা চাল তারি নাম মুড়ি—নামান্তরে শুধু রূপান্তর হয়েছে।

মদের পিঠ পিঠ এই চাটের উপমা আসায়, রায় মহাশয়ের পাত্র-মিত্রগণ মহা খুসি হয়ে অট্টহাস্যে ঘোষালের এ টীপ্পনির অনুমোদন করলেন। উজ্জ্বল-নীলমণি এর প্রতিবাদ করতে উদ্যত হবামাত্র, তার মাথার উপর থেকে একটা টিকটিকি বলে উঠল "ঠিক ঠিক ঠিক"। সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের প্রস্ফুরিত ও বিস্ফারিত নাসিকারন্ধ্র হতে একটা প্রচণ্ড সহাস্য "হেঁচ্চ"ধ্বনি নির্গত হয়ে, উজ্জ্বল নীলমণির বক্ষদেশ যুগপৎ হাস্য ও নস্যরসে সিক্ত করে দিলে। তিনি অমনি "রাধামাধব" বলে সরে বসলেন। রায় মহাশয় এই সব ব্যাপার দেখে শুনে ভারি চটে বললেন—

—তোমরা ক'টায় মিলে ভারি গণ্ডগোল বাধালে ত হে! আমি শুনতে চাইলুম গল্প আর এঁরা সুরু করে দিলেন তর্ক, আর সে তর্কের যদি কোনও মাথামুণ্ড থাকে। ঘোষাল! গল্প বল।

—হুজুর, এই বল্লুম বলে।

—শীগগির, নইলে এরা আবার তর্ক জুড়ে দেবে। একি আমার শ্রাদ্ধের সভা যে, নাগাড় পণ্ডিতের বিচার চলবে?

উজ্জ্বল-নীলমণি বললেন—

—আজ্ঞে, সে ভয় নেই। যে সভায় ঘোষাল বক্তা, সে সভায় যদি আমি আর মুখ খুলি ত আমার নামই নয়—

পণ্ডিত মশায়ের বচনটি খাপে খাপে মিলে গিয়েছে। কাল যে বর্ষা, তা ত সকলেই জানেন। তার উপর গোঁসাইজির কোকিলের সঙ্গে যে এক বিষয়ে সাদৃশ্যও আছে, সে ত প্রত্যক্ষ।

উজ্জ্বলনীলমণির গায়ে এই কথার নথ বসিয়ে দিয়ে ঘোষাল আরম্ভ করলে—

—তবে বলি শ্রবণ করুন।

—দেখ্, মধুর রসের বলে গল্প যেন একদম চিনির পানা করে তুলিস নে। একটু নুনঝাল যেন থাকে।

—হুজুর যে অরুচিতে ভুগছেন, তাকি আর জানিনে!

—আর দেখ্, একটু অলঙ্কার দিয়ে বলিস, একেবারে যেন সাদা না হয়।

—অলঙ্কারের সখই যে আজকাল হুজুরের প্রধান সখ, তা ত আর কারও জানতে বাকী নেই।

—কিন্তু সে অলঙ্কার যেন ধারকরা কি চুরিকরা না হয়।

—হুজুর, ভয় নেই। পরের সোনা এখানে কানে দেব না, তাহলে গোঁসাইজি তা হেঁচকাটানে কেড়ে নেবেন। কিন্তু এক্ষেত্রে নিজের জিনিস ব্যবহার করলে সবাই সোনাকে বলবে পিতল, আর বড় অনুগ্রহ করে ত—গিল্টি।

—অন্যে যে যা বলে তা বলুক; কিন্তু আসল ও নকলের প্রভেদ আমার চোখে ঠিক ধরা পড়বে।

ঘোষালের ত্রিকথা

—হুজুর জহুরি, সেই ত ভরসা। তবে শুনুন—

শ্রাবণ মাস, অমাবস্যার রাত্তির, তার উপর আবার তেমনি দুর্য্যোগ। চারিদিক একেবারে অন্ধকারে ঠাসা। আকাশে যেন দেবতারা আবলুশ কাঠের কপাট ভেজিয়ে দিয়েছে; আর তার ভিতর দিয়ে যা গলে পড়ছে তা জল নয়,—একদম আলকাতরা। আর তার এক একটা ফোঁটা কি মোটা, যেন তামাকের গুল—

—কাঠের কপাটের ভিতর দিয়ে জল কি করে গলে পড়বে বলত মূর্খ? যখন বর্ণনা সুরু করে দিস, তখন আর তোর সম্ভব অসম্ভবের জ্ঞান থাকে না। বল জল চুঁইয়ে পড়ছে!

—হুজুর বলতে চান আমি বস্তুতন্ত্রতার ধার ধারি নে। আজ্ঞে তা নয়, আমি ঠিকই বলেছি। জল গলেই পড়ছে, চুঁইয়ে নয়। কপাট বটে, কিন্তু—ফারকোরের কাজ, ভাষায় যাকে বলে জালির কাজ। সেই জালির ফুটো দিয়ে—

—দেখলেন স্মৃতিরত্ন, ঘোষালের ঠিকে ভুল হয় না। এই শুনে দেওয়ানজি বললেন—

—দেখলে ঘোষাল! ঠিকে ভুল কর্ত্তার চোখ এড়িয়ে যায় না।

—সে আর বলতে। হুজুর হিসেব নিকেশে যদি অত পাকা না হতেন তা হলে তাঁর বাড়িতে আর পাকা চণ্ডীমণ্ডপ হয়, আগে যাঁর চালে খড় ছিল না।

—তুমি কার কথা বলছ হে, আমার?

ফরমায়েসি গল্প

—যে নল চালায় সে কি জানে কার ঘরে গিয়ে সে নল ঢুকবে ? যাক্‌ ও সব কথা, এখন গল্প শুনুন।

এই দুর্যোগের সময় একটি ব্রাহ্মণের ছেলে, বয়েস আন্দাজ পঁচিশ ছাব্বিশ, এক তেপান্তর মাঠের ভিতর এক বটগাছের তলায় একা দাঁড়িয়ে ঠায় ভিজছিল।

—কি বললি! ব্রাহ্মণের ছেলে রাত দুপুরে গাছতলায় দাঁড়িয়ে ভিজছে আর তুই ঘরের ভিতর বসে মনের সুখে গল্প বলে যাচ্ছিস ? ও হবে না ঘোষাল, ওকে ওখান থেকে উদ্ধার করতেই হবে!

—হুজুর, অধীর হবেন না ; উদ্ধার ত করবই। নইলে মধুর রসের গল্প হবে কি করে ? কেউ ত আর নিজের সঙ্গে নিজে প্রেম করতে পারে না।

—তা ত জানি, কিন্তু তুই হয়ত ঐখানেই আর একটাকে এনে জোটাবি! গল্প সুরু করে দিলে তোর ত আর কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান থাকে না।

—দেখুন রায় মহাশয়, ঘোষাল যদি তা করে, তাতেও অলঙ্কার শাস্ত্রের হিসেবে কোনও দোষ হয় না। সংস্কৃত কবিরাও ত অভিসারিকাদের এমনি দুর্যোগের মধ্যেই বার করতেন।

—দেখুন পণ্ডিত মহাশয়, সেকালে তাদের হাড় মজবুত ছিল, একালের ছেলেমেয়েদের আধঘণ্টা জলে ভিজলে নির্ঘাৎ pneumonia হবে। এ যে বাঙলাদেশে, তায় আবার কলিকাল।

ঘোষালের ত্রিকথা

এ কথা শুনে উজ্জ্বলনীলমণি আর স্থির থাকতে পারলেন না, সবেগে বলে উঠলেন—

—তাতে কিছু যায় আসে না ম'শায়। পদাবলী পড়ে দেখবেন,—কি ঝড়জলের মধ্যে অভিসারিকারা ঘর থেকে বেরিয়ে পড়তেন, এবং তাতে করে তাঁদের কারও যে কখনও অপমৃত্যু ঘটেছে, এ কথা কোনও পদাবলীতে বলে না। আসল কথাটা কি জানেন, মনের ভিতর যার আগুন জ্বলেছে, বাইরের জলে তার কি করবে?

—হুজুর ত ঠিকই ভয় পেয়েছেন। অভিসারিকাদের চামড়া মোমজামা হতে পারে, কিন্তু তাই বলে ব্রাহ্মণ সন্তানকে জলে ভেজালে যে ব্রহ্মহত্যা হবে না, কে বলতে পারে? অভিসারক বলে ত আর কোনও জানোয়ার নেই। দেখুন হুজুর, ব্রাহ্মণের ছেলে ভিজছিল বটে, কিন্তু তার গায়ে জল লাগছিল না। তার মাথায় ছিল ছাতা, গায়ে বর্ষাতি, আর পায়ে বুটজুতো। তারপর শুনুন—

শুধু ঝড়জল নয়। মাথার উপর বজ্র ধমকাচ্ছিল আর চোখের সুমুখে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল। সে এক তুমুল ব্যাপার। লাখে লাখে তুবড়ি ছুটছে, ঝাঁকে ঝাঁকে হাউই উড়ছে, তারি ফাঁকে ফাঁকে বোমা ফুটছে—সেদিন স্বর্গে হচ্ছিল দেওয়ালি।

—কি বললি ঘোষাল, শ্রাবণ মাসে দেওয়ালি?—তুই দেখছি পাঁজি মানিস নে!

—আজ্ঞে আমি মানি, কিন্তু দেবতারা মানেন না। স্বর্গে ত সমস্তক্ষণই শুভক্ষণ। কি বলেন পণ্ডিত মশায়?

—চোর বেটারা যেন ভেল চালায়, কিন্তু দেশের লোক তা নেয় কেন?

—আজ্ঞে সস্তা বলে।

—অনেকক্ষণ চুপ করে থাকা উজ্জ্বলনীলমণির ধাতে ছিল না। তিনি বললেন :—

ঘোষাল যাদের কথা বলছে তারা সব প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ। আমার পাসকরা শিষ্যেরাই হচ্ছে খাঁটি বৈদান্তিক বৈষ্ণব।

—অর্থাৎ এঁদের কাছে সাকার ও নিরাকারের ভেদ শুধু উপসর্গে; এবং সে ভেদজ্ঞানও এঁদের নেই, এরা খুসিমত 'সা'র জাগায় 'নি' এবং 'নি'র জায়গায় 'সা' বসিয়ে দেন!

রায় মহাশয়ের আর ধৈর্য্য থাকল না। তিনি বেজায় রেগে উঠে চীৎকার করে বললেন :—

তোমার টীকা টিপ্পনি রাখো হে ঘোষাল! আমার কাছে ও-সব বুজরুকি চলবে না। ইষ্টুপিটরা দু'পাতা ইংরেজি পড়ে সব সোহহং হয়ে উঠেছে। আমি জানি এরা সব কি—হয় বর্ণচোরা নাস্তিক, নয় বর্ণচোরা খৃষ্টান। ঐ অকালকুষ্মাণ্ডটা বৈদান্তিক শাক্তই হোক আর বৈদান্তিক বৈষ্ণবই হোক, গেরস্তই হোক আর সন্ন্যাসীই হোক, স্বদেশীই হোক আর বিদেশীই হোক, তোমার ঐ ব্রাহ্মণের ছেলের ঘাড় ধরে ঐ দেবতার পায়ে মাথা ঠেকাও।

—হুজুর, ওকে দিয়ে যদি এখন প্রণাম করাই তাহ'লে আমার গল্প মারা যায়।

—আর যদি প্রণাম না করে ত কান ধরে মন্দির থেকে বার করে দে।

—হুজুর, তাহলেও আমার গল্প মারা যায়।

—যাক্ মারা। আমি ঐ সব গোঁয়ারগোবিন্দ লোকের যথেচ্ছাচারের কথা শুনতে চাইনে।

—হুজুর যদি জোর করেন ত আমি নাচার। গল্প তাহলে এইখানেই বন্ধ করলুম।

—বেশ! এ মাসের মাইনেও তাহলে এইখানেই বন্ধ হল।

এই কথা শুনে ঘোষাল শশব্যস্তে বলে উঠল :—

হুজুর, আপনি মিছে রাগ করছেন। মূর্তিটে যদি দেবী না হয়ে মানবী হয়?

—এ আবার কি আজগুবি কথা বার করলি? এই ছিল দেবতা আর এই হয়ে গেল মানুষ!

—দেবতা যে মানুষ আর মানুষ যে দেবতা হয়, এ ত আর আজগুবি কথা নয়। এ কথা ত সকল দেশের সকল শাস্ত্রেই আছে, তবে আমি ত আর পুরাণকার নই। এরকম ওলটপালট আমি করলে কেউ তা মানবে না, আপনিও বলবেন ওর ভিতর বস্তুতন্ত্রতা নেই। ব্যাপারখানা আসলে কি তা বলছি। হুজুর মনোযোগ করবেন। ব্রাহ্মণের ছেলে যখন মন্দিরের দরজা ঠেলছিল তখন ভিতরে যদি জনপ্রাণী না থাকত, তাহলে হুড়কো খুলে দিলে কে? আর যখন দেখা গেল যে মন্দিরের মধ্যে অপর কোনও কিছু

নেই, তখন আগে যাঁকে প্রতিমা বলে ভুল হয়েছিল, তিনিই যে ও দ্বার মুক্ত করেছিলেন, সে বিষয়ে আর কোনও সন্দেহ থাকতে পারে না। সেটি যখন দেখতে দেবীর মত নয় তখন অপ্সরা না হয়ে আর যায় না!

—খুব কথা উল্টে নিতে শিখেছিস বটে।

—ব্রাহ্মণের ছেলে যখন দেখলে যে, সেই মূর্ত্তিটির চোখে পলক পড়ছে, নাকে নিঃশ্বাস পড়ছে, তখন আর তার বুঝতে বাকী থাকল না যে, স্বর্গের কোনও অপ্সরা অভিসারে বেরিয়েছিল, অন্ধকারে পথ ভুলে পৃথিবীতে এসে পড়েছে, আর এই ঝড়বৃষ্টির ঠেলায় এই মন্দিরে এসে আশ্রয় নিয়েছে। বেচারা মহা ফাঁপরে পড়ে গেল। দেবী হলে পূজা করতে পারত, মানবী হলে প্রণয় করতে পারত, কিন্তু অপ্সরাকে নিয়ে সে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ল। তার মনের ভিতর একদিক থেকে ভক্তি আর একদিক থেকে প্রীতি ঠেলে উঠে পরস্পর লড়াই করতে লাগল।

—কি বললি, ভক্তি ও প্রীতি পরস্পর লড়াই করতে লাগল? ও দুই ত এক সঙ্গেই থাকে।

—ও দুই শুধু একসঙ্গে থাকে না, একই জিনিস। আমাদের মতে ভক্তি পরাপ্রীতি আর প্রীতি অপরাভক্তি।

—মাপ করবেন গোঁসাইজি। ভক্তির জন্ম ভয়ে, আর প্রীতির জন্ম ভরসায়। ও দুই একসঙ্গে ঘর করে বটে, কিন্তু সে বোন-সতীনের মত।

—ব্রাহ্মণের ছেলেকে ওরকম অকষ্টবদ্ধে ফেলে রাখা ঠিক নয়!

অপ্সরাদের প্রতি ভক্তি! রামো, সে ত হবারই জো নেই, তবে প্রণয়ে দোষ কি!

—হুজুর, দোষ কিছু নেই, সম্পর্কে বাধে না। তবে লোকে বলে অপ্সরার সঙ্গে প্রেম করলে মানুষ পাগল হয়।

—কথা ঠিক, কিন্তু সে হচ্ছে একরকম সৌখীন পাগলামি। স্ত্রীলোকের সঙ্গে ভালবাসায় পড়লে লোকে মাথায় মধ্যম নারয়ণ মাখে না, মাখে কুন্তলবৃষ্য। আর অপ্সরার টানে মানুষ হয় উন্মাদ পাগল। তখন স্বর্গে না গেলে আর মানুষের নিস্তার নেই, অথচ সেখানে প্রবেশ নিষেধ। কি বলেন পণ্ডিত মশায়?

—প্রমাণ ত হাতেই রয়েছে,—বিক্রমোর্ব্বশী।

—শুনলেন হুজুর, পণ্ডিত মশায় কি বললেন? এ অবস্থায় ব্রাহ্মণ সন্তানটীকে কি করে ভালবাসায় ফেলি?

—তাহলে কি গল্প এইখানেই বন্ধ হল?

—আজ্ঞে তাও কি হয়! যা হল তা শুনুন:—

ব্রাহ্মণের ছেলেকে অমন উসখুস করতে দেখে, সেই মূর্ত্তিটিও একটু ভীত ত্রস্ত হয়ে উঠল, অমনি তার কাঁধ থেকে অঞ্চল পড়ল খসে। ব্রাহ্মণের ছেলে দেখতে পেলে তার কাঁধে ডানা নেই, ব্যাপারটা যে কি তখন আর তার বুঝতে বাকি থাকল না। এখন বুঝছেন হুজুর, ওকে দিয়ে প্রণাম করালে কি অনর্থটাই ঘটত? একে তরুণ বয়েস, তাতে আবার হাতের গোড়ায়, পড়ে-পাওয়া ডানাকাটা পরি! তার উপর আবার এই দুর্য্যোগের সুযোগ। এ অবস্থায় পঞ্চতপা ঋষিদেরই মাথার ঠিক থাকে না—ব্রাহ্মণের

ছেলে ত মাত্র বালা-যোগী। পরস্পর পরস্পরের দিকে চাইতে লাগল। ব্রাহ্মণ যুবক সিধেভাবে, আর যুবতীটি আড়ভাবে। চার চক্ষুর মিলন হবামাত্র সেই সুন্দরীর নয়ন-কোণ থেকে একটি উল্কাকণা খসে এসে ব্রাহ্মণের ছেলের চোখের ভিতর দিয়ে তার মরমে গিয়ে প্রবেশ করলে। ব্রাহ্মণের ছেলের বুক বিলেতি বেদান্ত পড়ে পড়ে শুকিয়ে একেবারে সোলার মত চিমসে ও খড়-খড়ে হয়ে গিয়েছিল, কাজেই সেই সুন্দরীর চোখের চকমকি-ঠোকা আগুনের ফুলকিটি সেখানে পড়বা মাত্র সে বুকে আগুন জ্বলে উঠল। আর তার ফলে, তার বুকের ভিতর যে ধাতু ছিল সে সব গলে একাকার হয়ে উথলে উঠতে লাগল আর অমনি তার অন্তরে ভূমিকম্প হতে সুরু হল। তার মনে হল যেন তার পাঁজরা সব ধসে যাচ্ছে; সঙ্গে সঙ্গে তার সর্বাঙ্গ থর থর করে কাঁপতে লাগল, মুখের ভিতর কথা জড়িয়ে যেতে লাগল, মাথা দিয়ে ঘাম পড়তে লাগল। এক কথায় ম্যালেরিয়া-জ্বর আসবার সময় মানুষের যে অবস্থা হয় তার ঠিক সেই অবস্থা হল। ব্রাহ্মণের ছেলে বুঝলে তার বুকের ভিতর ভালবাসা জন্মাচ্ছে।

এই বর্ণনা শুনে উজ্জ্বলনীলমণি অত্যন্ত দুঃখব্যঞ্জক স্বরে বলে উঠলেন :—

আহা! পূর্বরাগের কি চমৎকার বর্ণনাই হল! রসশাস্ত্রে যাকে বলে সাত্ত্বিক ভাব তার উপমা হল কি না ম্যালেরিয়া-জ্বর। ঘোষাল যখন মধুর রসের কথা পেড়েছিল, তখনই জানি ও শেষটা বীভৎস রস এনে ফেলবে। আর লোকে বলবে, ঘোষাল কি রসিক!

ঘোষাল এ সব কথার কোন উত্তর না করে স্মৃতিরত্নের দিকে চাইলে। সে চাউনির অর্থ—মশায় জবাব দিন। স্মৃতিরত্ন বললেন :—

ত্রিগুণের সাম্যাবস্থাতেই ত চিত্ত প্রকৃতিস্থ থাকে। আর তুমি যাকে সাত্ত্বিকভাব বলছ, সেও ত একটা চিত্তবিকার ছাড়া আর কিছুই নয়। সুতরাং ও মনোভাবকে মনের জ্বর বলায় ঘোষাল কি অন্যায় কথা বলেছে?

—পণ্ডিত মশায়, শুধু তাই নয়। ম্যালেরিয়ার সঙ্গে ও জিনিসের আরও অনেক মিল আছে। দুয়ের চিকিৎসাও এক, মধুর রসেরও ওষুধ তিক্ত রস। তত্ত্বকথার কুইনিন্ খাওয়ালে ভালবাসা মানুষের মন থেকে পালাতে পথ পায় না।—

দেওয়ানজি এ কথার প্রতিবাদ করে বললেন—কুইনিনে বুঝি জ্বর ছাড়ে? শুধু আটকে দেয়। শিশি শিশি কুইনিন গিলেছি কিন্তু আমার পিলে—

রায় মহাশয় এতক্ষণ অন্যমনস্ক হয়ে কি ভাবছিলেন। ঘোষাল-নীলমণি ও স্মৃতিরত্নের কথায় তিনি কাণ দেন নি, কিন্তু দেওয়ান-জির কথাটি তাঁর কাণে পৌচেছিল। তিনি মহা গরম হয়ে বললেন :—

চুপ করো হে দেওয়ানজি, তোমার পিলে কত বড় হয়ে উঠছে, সে কথা শুনে শুনে আমার কাণ পচে গেল। ঘোষালের যে যকৃৎ শুকিয়ে যাচ্ছে, কৈ ও ত তা নিয়ে রাত নেই দিন নেই যার তার কাছে নাকে কাঁদতে বসে না। পিলে যকৃতের চাইতে

যা দশগুণ বেশি সাংঘাতিক, তাই হয়েছে ঐ ব্রাহ্মণের ছেলের,—হৃদরোগ। ও-যে কি ভয়ানক রোগ তা আমি ভুগে ভুগে টের পেয়েছি। সে যা হোক, ঘোষাল যে একটা ব্রাহ্মণের ছেলেকে রাতদুপুরে একটা তেপান্তর মাঠের ভিতর একটা মন্দিরের মধ্যে একটা মেয়ের হাতে সঁপে দিলে, অথচ তার কে বাপ কে মা, কি জাত কি গোত্র জানা নেই; সে বিষয়ে দেখছি তোমাদের কারও খেয়াল নেই। হ্যা দেখ্ ঘোষাল, তুই ব্রাহ্মণের ছেলের জাত মারবার আচ্ছা ফন্দি বার করেছিস! উজ্জ্বলনীলমণি যে বলেছিল তোর ধর্ম্মজ্ঞান নেই, এখন দেখছি সে কথা ঠিক।

—আজ্ঞে সে কথা আমি অন্য সূত্রে বলেছিলুম। যা ঘটনা হয়েছে তাতে ঘোষালের দোষ নেই। পূর্ব্বরাগ ত আর জাত-বিচার করে হয় না। এ বিষয়ে বিদ্যাপতি ঠাকুর বলেছেন "পানি পিয়ে পিছু জাতি বিচারি"—

—বটে! তবে যাও মুসলমানের ঘরে খাও পানি—বদনায় করে। তারপরে এখানে একবার জাতবিচার করতে এসে দেখো কি হয়!

—হুজুর, গোঁসাইজি কথা ঠিকই বলেছেন, শুধু একটা কথায় একটু ভুল করেছেন। "পানি" না বলে ব্রাণ্ডিপানি বললে আর কোনও গোলই হত না। জল অবশ্য যার তার হাতে খাওয়া যায় না, কিন্তু মদ সকলের হাতেই খাওয়া যায়। আর ভালবাসা জিনিসটে ত দুনিয়ার সেরা মদ।

—তোর দেখছি হতভাগা শুঁড়িখানা ছাড়া আর কোথায়ও

উপমা জোটে না। তোরা দুটোয় মিলেছিস ভাল। একে মনসা তায় ধুনোর গন্ধ। একে ঘোষাল মূলগায়েন তার উপর আবার উজ্জ্বল নীলমণি দোহার। এ বিষয়ে আমি পণ্ডিত মহাশয়ের মত শুনতে চাই, তোদের কথা শুনতে চাই নে।

—অজ্ঞাত-কুলশীলার প্রতি ভালবাসার ঐরূপ আচম্বিতে জন্মলাভটা স্মৃতির হিসেবে নিন্দনীয়, কিন্তু কাব্যের হিসেবে প্রশস্ত। শকুন্তলা, দময়ন্তী, মালবিকা, বাসবদত্তা, রত্নাবলী, মালতী প্রভৃতি সব নায়িকারই ত—

—আজ্ঞে তা ত হবেই। স্মৃতির কারবার মানুষের জীবন নিয়ে আর কাব্যের কারবার তার মন নিয়ে।

—কাব্যের শিক্ষা আর স্মৃতির শিক্ষা যদি উলটো হয়, তাহলে মানুষে কোন্‌টা মেনে চলবে?

—দুটোই। কাজকর্মে স্মৃতি আর লেখাপড়ায় কাব্য।

—দেখুন রায় মহাশয়, ঐখানেই ত স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়দের সঙ্গে আমাদের মতের অমিল। আমরা বলি রস এক—তা সে জীবনেরই হোক আর কাব্যেরই হোক।

—তাহলে আপনারা কি চান যে, গল্পটা হোক জীবনের মত আর জীবনটা হোক গল্পের মত?

—আজ্ঞে তা নয় হুজুর। ভট্টাচার্য্য-মতে, জীবনে ফেন ফেলে দিয়ে ভাত খেতে হয় আর কাব্যে ভাত ফেলে দিয়ে ফেন খেতে হয়; কিন্তু গোস্বামী-মতে কি জীবনে কি কাব্যে একমাত্র গলা ভাতেরই ব্যবস্থা আছে।

ফরমায়েসি গল্প

—তুমি থামো ঘোষাল, এ সব বিষয়ে বিচার করবার অধিকার তোমার নেই। পরিণামবাদ কাকে বলে যদি বুঝতে······

—ঘোষাল তা না বুঝতে পারে, কিন্তু অপরিণামবাদ কাকে বলে তা বুঝলে আপনি ও-সব বাক্য মুখ দিয়ে উচ্চারণ করতেন না। অলঙ্কার-শাস্ত্র যদি ধর্ম্মশাস্ত্রের সিংহাসন অধিকার করে, তাহলে তার পরিণাম সমাজের পক্ষে কি ভীষণ হয় ভেবে দেখুন ত!

—ঠিক বলেছেন পণ্ডিত মশায়, উনি কাব্যে ও সমাজে ভেঙ্গে দিতে চান যে দুয়ের প্রভেদ আকাশপাতাল। সমাজে হয় আগে বিয়ে, পরে সন্তান, তারপরে মৃত্যু; আর কাব্যে হয় আগে ভালবাসা, তারপর হয় বিয়ে, নয় মৃত্যু। এক কথায় মানুষের জীবনে যা হয় তার নাম প্রাণান্ত! কাব্য কিন্তু হয় মিলনান্ত নয় বিয়োগান্ত; হয় ঘটক নয় ঘাতক হওয়া ছাড়া কবিদের আর উপায় নেই।

—তাহলে তুই দেখছি ঐ ব্রাহ্মণের ছেলের হয় জাত মারবি, নয় প্রাণ মারবি!

—আজ্ঞে প্রাণে মারতে পারি কিন্তু জাত কিছুতেই মারব না। হুজুরের কাছে গল্প বলছি, আর আমার নিজের প্রাণের ভয় নেই?

—দেখ তোকে আগে বলেছি ব্রহ্মহত্যা কিছুতেই হতে দেব না।

—আজ্ঞে যদি আথেরে মাথায় বাজ পড়ে লোকটা মারা যায় সেও কি আমার দোষ?—এ দুর্য্যোগ কি আমি বানিয়েছি?

ঘোষালের ত্রিকথা

—কি বললি? ব্রাহ্মণের অপমৃত্যু, মন্দিরের ভিতরে আর আমার সুমুখে, বেটা আজ গাঁজা টেনে এসেছিস বুঝি! যেমন করে পারিস মিলনান্ত করতেই হবে—বিয়োগান্ত কিছুতেই হতে দেব না।

—আজ্ঞে আমিও ত সেই চেষ্টায় আছি। তবে ঘটনাচক্রে কি হয় তা বলতে পারি নে। একটা কথা আপনার পা ছুঁয়ে বলছি, যেমন করেই হোক আমি ওর জাত আর প্রাণ—দু-ই টিকিয়ে রাখব, তারপর যা হয়! হুজুর আমার বেয়াদবি মাপ করবেন, যদি একটু ধৈর্য্য ধরে না থাকেন তাহলে গল্প এগুবে কি করে, আর যদি না এগোয় ত তার অন্তই বা হবে কি করে।

—আচ্ছা বলে যা।

—তবে শুনুন:—

ব্রাহ্মণের ছেলে প্রথমটা যতটা হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিল, শেষে আর ততটা থাকল না। সব বিপদের মত ভালবাসার প্রথম ধাক্কাটা সামলানো মুস্কিল, তারপর তা সয়ে আসে। ক্রমে যখন তার জ্ঞান-চৈতন্য ফিরে এল, তখন সে সেই মেয়েটিকে ভাল করে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। প্রথমেই তার চোখে পড়ল যে মেয়েটির মাথার চুল কপালের উপর চূড়ো করে বাঁধা, আমাদের মেয়েরা নেয়ে উঠে চুল যেমন করে বাঁধে তেমনি করে, বোধহয় চুল ভিজে গিয়েছিল বলে। তারপর চোখে এসে ঠেকল তার গড়ন। সে অঙ্গসৌষ্ঠবের কথা আর কি বলব! তার দেহটি ছিল তার চোখের মত লম্বা, তার নাকের মত সোজা আর তার ঠোঁটের মত পাতলা। কিন্তু বেচারি

ভিজে একেবারে সপসপে হয়ে গিয়েছিল। তার শাড়ী চুঁইয়ে দর-বিগলিত ধারে জল পড়ছিল, মনে হচ্ছিল যেন তার সর্ব্বাঙ্গ রোদন করছে। এই দেখে ব্রাহ্মণের ছেলের ভারি মায়া হল, সঙ্গে সঙ্গে তার বুকের ভিতরও আত্মাপ্রাণী কাঁদতে সুরু করে দিল।

"—চলে নীলশাড়ী নিঙাড়ি নিঙাড়ি
পরাণ সহিত মোর।"

—কি? কি? উজ্জ্বলনীলমণি আবার কি বলে?

—হুজুর, গোঁসাইজির ভাব লেগেছে, তাই ইনি পদাবলী আওড়াচ্ছেন। উনি বলছেন—

"—চলে নীলশাড়ী নিঙাড়ি নিঙাড়ি
পরাণ সহিত মোর।"

—ঘোষাল! মেয়েটার পরণে কি রঙের শাড়ী ছিলরে?

—হুজুর লাল।

—আঃ! ঐ এক কথায় সব মাটি করলে হে!—

"—চলে লাল শাড়ী নিঙাড়ি নিঙাড়ি
পরাণ সহিত মোর।"

বললে ও কবিতার আর থাকে কি? আর যার তুল্য কবিতা ভূ-ভারতে কখনো হয়ও নি, হবেও না, তারই কি না জাত মেরে দিলে?

—গোঁসাইজি গোসা করছেন কেন? আমি যে—রঙ চড়িয়েছি তাতেই তো উপমা মেলে। মানুষের পরাণ যদি কেউ নিঙড়ায় তা হলে তা থেকে যা বেরোবে তার রঙ ত লাল। তবে বলতে

পারিনে, হতে পারে যে কারও কারও রক্তের রঙ ও চামড়ার রঙ এক—ঘোর নীল।

—নাই পেয়ে পেয়ে এখন দেখছি তুমি ভদ্রলোকের মাথায় চড়ছ।

—রাগ করেন কেন মশায়! কোনও সাহেবকে যদি বলা যায় যে তোমার গায়ের রক্ত নীল, তাহলে ত সে না চাইতে চাকরি দেয়।

আবার একটা বকাবকির সূত্রপাত দেখে রায় মহাশয় হুঙ্কার ছেড়ে বললেন,—

—যদি কথায় কথায় তর্ক তুলিস তাহলে রাত দুপুরেও গল্প শেষ হবে না—আর তুই ভেবেছিস এইখানেই আজ রাত কাটাব?

—হুজুর, তর্ক আমি কৈরি! আমি একজন গুণী লোক—নাভলিষ্ট। কথায় বলে যাদের আর গুণ নেই তাদের ছার গুণ আছে। যারা গল্প করতে পারে না তারাই ত তর্ক করে।

—ভারি গুণী! কি চমৎকার গল্পই বলছেন!

—বটে! আমি এইখান থেকেই ছেড়ে দিচ্ছি, আপনি গোসাইজি, তারপর চালান দেখি ত কতক্ষণ চালাতে পারেন, হুজুরের এক প্রশ্নের ধাক্কাতেই উল্টে চিৎপাত হয়ে পড়বেন—

—ওরে ঘোষাল, ভাল কথা মনে করিয়ে দিয়েছিস্। আমার আর একটা প্রশ্ন আছে, মেয়েটার বয়স কত?

—উনিশ কি বিশ।

ফরমায়েসি গল্প

—সধবা কি বিধবা ?

—কুমারী। কাব্যে হুজুর কুমারী ছাড়া আর কিছু ত চলে না।

—আমাকে বোকা পেয়েছিস না খোকা পেয়েছিস্। ছ-ছেলের মা'র বয়েসী, আর তিনি হলেন কুমারী ? বাঙালীর ঘরে কোথায় এত বড় আইবুড়ো মেয়ে দেখেছিস বল ত ?

—হুজুর, মেয়েটি ত বাঙালী নয়—হিন্দুস্থানী।

—যেই একটা মিথ্যা কথা ধরা পড়েছে অমনি আর একটা মিথ্যে কথা বানাচ্ছিস। কোথাও কিছু নেই, বলে কিনা হিন্দুস্থানি !

—হুজুর, তার গায়ে ঝুলছিল সলমাচুমকির কাজ করা ওড়না, আর তার শাড়ীর সুমুখে ঝুলছিল কোঁচা।

—হোক না হিন্দুস্থানী। হিন্দুস্থানীও ত হিন্দু। আর তোদের চাইতে ঢের পাকা হিন্দু। জানিস দুধের দাঁত পড়বার আগে মেয়ের বিয়ে না হলে তাদের জাত যায় ? কোন হিন্দুস্থানী হিঁদুর বাড়ীতে অত বড় মেয়ে আইবুড় দেখেছিস বলত গাধা !

—হুজুর, মেয়েটা হিঁদু নয়, মুসলমান।

—কি বললি ? মুসলমান ? হিন্দুর মন্দিরে যেখানে শূদ্রের প্রবেশ নিষেধ, সেইখানে রাসকেল মুসলমান ঢুকিয়েছিস। মন্দির অপবিত্র হবে, ব্রাহ্মণের ছেলের জাত যাবে, কি সর্ব্বনাশের কথা ! লক্ষ্মীছাড়িকে এখনি মন্দির থেকে বার করে দে !

—হুজুর, এই দুর্যোগের মধ্যে—

ঘোষালের ত্রিকথা

—দুর্য্যোগ ফুর্য্যোগ জানি নে, এই মুহূর্ত্তে ঐ মুসলমানীকে দে অর্দ্ধচন্দ্র।

—হুজুর, বাইরে ত দেবতা অপ্রসন্ন আর ভিতরেও যদি দেবতা আশ্রয় না দেন ত বেচারা যায় কোথায়? হোক না মুসলমান, মানুষ ত বটে, আমাদের মত ওরও রক্ত-মাংসের শরীর।

—খোপ্‌সুরতি দেখে বেটার ধর্ম্মজ্ঞান লোপ পেয়েছে! আমার হুকুম মানবি কি না বল্? হয় ওকে মন্দির থেকে বার কর, নয় তোকে ঘর থেকে বার করে দিচ্ছি,—এই জমাদার! ইস-কো গরদান পাকড়কে নিকাল দেও!

—হুজুর, একটু সবুর করুন। হুজুরের হুকুম তামিল না করতে হলে আমাকে কি আর এতটা বেগ পেতে হত? ওকে কি আমাকে কাউকে গরদানি দিতে হবে না। মেয়েটি হিন্দুস্থানীও নয়, মুসলমানীও নয়, বাঙালী কুলিন ব্রাহ্মণের মেয়ে।

—আবার মিথ্যে কথা! কুলীনের মেয়ের গায়ে ওড়না ওড়ে আর সে কোঁচা দিয়ে শাড়ী পরে!

—হুজুর, ও আমার দেখবার ভুল। শাড়ীটে ভিজে সুমুখের দিকে জড় হয়ে গিয়েছিল তাই দেখাচ্ছিল যেন কোঁচা, আর গা[illegible]

[illegible]।

—এই যে বললি সলমা চুমকির কাজ করা?

—হুজুর, ঐ চাদরের উপর গোটাকতক জোনাকি বসেছিল তাই চুমকির মত দেখাচ্ছিল।

—তাই বল্! আঃ! বাঁচা গেল। ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল!

কমায়েসি গল্প

—হুজুর, আপনার না হোক আমার ত তাই। জমাদারের নাম শুনে ভয়ে ত আমার পাঁচ-প্রাণ দশদিকে উড়ে গেছল। ভুল করে একটা কথা……

—অমন ভুল করিস কেন?

—হুজুর, অমন ভুল অনেক বড় বড় [illegible]রাও করেন, আমি ত কোন্ ছার, তবে তাঁদের বেলায় সে সব [illegible]পার ভুল বলে পার পেয়ে যায়।

—সে যাই হোক। ঘোষাল এতক্ষণে গল্পটা বেশ গুছিয়ে এনেছে। কুলীন ব্রাহ্মণের মেয়ে, এতদিন বিয়ে হয় নি, শেষটা ভগবানের অনুগ্রহে কেমন বড় জুটে গেল। একেই ত বলে প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ। ঘোষাল, তোর মুখে ফুলচন্দন পড়ুক। তুই যে খালি ব্রাহ্মণের ছেলের জাত বাঁচিয়েছিস্ তাই নয়—ব্রাহ্মণের মেয়ের বাপেরও জাত বাঁচিয়েছিস্। এখন নিশ্চিন্ত মনে গল্প বলে যা। কি খেয়ে গল্প বলিস্ বল্ ত? এবার তোকে বিলেতি খাওয়াব।

—হুজুরের, প্রসাদ চরণামৃত জ্ঞানে পান করব, তারপরে মুখ দিয়ে বেরবে অনর্গল বিলেতি গল্প। এখন না হল শুনুন :—

ভালবাসা জিনিসটে অন্তত কাব্যে একটা ক্রামক ব্যাধি। কবিরা এক জনের মনের সিগারেট থেকে আর একজনের মনের সিগারেট ধরিয়ে নেন। কাব্যের এ হচ্ছে মামুলি দস্তুর। তাই আমাকে বলতেই হবে যে ব্রাহ্মণের ছেলের ভালবাসার ছোঁয়াচ লেগে সেই কুলীন-কুমারীর মনে, শ্যাম্পেনের নেশার মত আস্তে আস্তে ভালবাসার রং ধরতে সুরু করল।

ঘোষালের ত্রিকথা

—কি বললি? শ্যাম্পেনের নেশার মত আস্তে আস্তে! গাছে না উঠতেই এক কাঁদি! বিলেতির নাম শুনেই অজ্ঞান হয়েছিস্ আর বেফাঁস বকছিস। বেটা খাঁটির খদ্দের, শ্যাম্পেনের গুণাগুণ তুই কি জানিস্! পোর্ট বল্,—আমার ত আর কিছু জানতে বাকি নেই! শ্যাম্পেনের নেশা হয় ধরেনা, নয় চট্ করে মাথায় চড়ে যায়। ভালবাসার নেশা যদি আস্তে আস্তে চড়াতে চাস্ ত সেরীর সঙ্গে তুলনা দে,—গেলাসের পর গেলাসে যা রেক্তার গাথুনি গেঁথে যায়!

—হুজুর ঠিক বলেছেন, মেয়েমানুষের মনে ভালবাসা আস্তে আস্তে বাড়ে বটে, কিন্তু তার বনেদ খুব পাকা হয়। ওদের মনে ও-বস্তু একবার শিকড় গাড়লে তা আর উপড়ে ফেলা যায় না, কেননা সে শিকড় শুধু ভিতরের দিকেই ডুব মারে। কিন্তু হুজুর এইখানে একটু মুস্কিলে পড়েছি। স্ত্রীলোকের ভালবাসা বর্ণনা করা যায় না, কেননা তার কোন বাইরের লক্ষণ দেখা যায় না; আর যদি দেখা যায়, তাহলেই বুঝতে হবে সে সব হাবভাব, ভিতরে সব ফাঁকা।

—তবে কি ওদের মনের কথা জানবার জো নেই?

—আমি ত তা বলিনি, আমি বলছি জানা দুঃসাধ্য কিন্তু অসাধ্য নয়। ওদের মুখ ওদের বুকের আয়না নয়। যেমন পুরুষের পাণ্ডুরোগ, তেমনি স্ত্রীলোকের হৃদরোগ ধরা পড়ে চোখে, এখানেও মেয়েটা ঐ চোখেই ধরা দিলে। কি হল শুনুন:—

তার চোখের ভিতর একটা অতি টিমে অতি ঠাণ্ডা আলো ফুটে

খোষালের হেঁয়ালী

—না, কীর্ত্তন নয়।

—কেন ?

—কীর্ত্তন তুমি আমার মত গাইতে পারবে না। ধর ঐ গানটার ভিতর যত মনের আক্ষেপ প্রকাশ করতে হবে, আখর দিয়ে নয়, সুরের টান টেনে। নইলে কীর্ত্তন হয়ে পড়ে নেড়া গান।

—তুমি বলতে চাও নেড়ানেড়ির গান। যথা, আমি চাপান দিলুম—"যদি গৌর চাস, কাঁথা নে ধনী ;" আর তুমি উতোর গাইলি, "এ পূজোতে ঝুমকো দিবি, তবে ঘরে রব।"

—এ কীর্ত্তনে অবশ্য আবদার আছে, আক্ষেপ নেই। আর তা ছাড়া ও সব ভাবের কীর্ত্তন নয়, অভাবের সং-কীর্ত্তন। ও সংপনা এ দরবারে চলবে না।

—তাহলে আমাকে কি গাইতে হবে ?

—হিন্দী।

—তোমাকে যে ক'টি গান শিখিয়েছি, তারি মধ্যে দুয়েকটি।

—হ্যাঁ। "গোরে গোরে মুখপর"ও চলবে, "চমেলি ফুলি চম্পা"ও চলবে।

—তুমি বলতে চাও সে মজলিসে গোরে গোরে মুখও থাকবে, চমেলি ফুলি চম্পাও থাকবে।—তবে কথা হচ্ছে, আমার সঙ্গে সঙ্গত করবে কে ?

—খেয়ালের ভারিত তাল। আমি খঞ্জনীতে ঠেকা দেব এখন। তোমার তাল আমি সামলে নেব।

—তাহলে আমি নির্ভয়ে গাইতে পারব।

—আচ্ছা, তবে আসি। মেয়েদের সন্ধ্যে আহ্নিক হয়ে যাবার পর রাধানাথ শিকদের এসে তোমাকে নিয়ে যাবে।

—আচ্ছা, হুকুম ঠিক তামিল করব। ইতিমধ্যে দুর্গানাম জপ করি।

—মধ্যে মধ্যে মা'র নাম স্মরণ করা ভাল, বিশেষতঃ চির-কুমারের পক্ষে।

সখীরাণীর গুণাগুণ

আপনাকে বলতে ভুলে গিয়েছি যে, সখীরাণী আমার পূর্ব্ব-পরিচিত। এ বাড়ীতে তার গতিবিধি ছিল অবাধ। তার তুল্য স্বাধীন জেনানা আমি আর একটিও দেখিনি। সে বোষ্টমের মেয়ে, তাই মনুর বিধিনিষেধের সে তোয়াক্কা রাখত না। সংসারে তার কোনরকম বন্ধন ছিল না; কারণ সে কুমারীও নয়, সধবাও নয়, বিধবাও নয়। উপরন্তু সে সুন্দরী ও গুণী। তার যে রূপ আছে, সে তা' জানত; কারণ না জানবার তার উপায় ছিল না। আর সে কীর্ত্তন গাইত চমৎকার। তারপর সে ছিল আমার শি[illegible]। রাণীমার ইচ্ছায় আর রায় মহাশয়ের আদেশে আমি তাকে হিন্দী-[illegible] সাদাসিধে মামুলী গান; অর্থাৎ সেই সব গান যা' আজও বাতিল হয় নি, যদিচ লোকে সেগুলো নবাবী আমল থেকে গেয়ে আসছে। আমি তাকে তান শেখাইনি, পাছে তার গলার অপূর্ব্ব টান নষ্ট হয়। সুরের প্রাণ তার কাঁপুনির

উপর নির্ভর করে না; করীকর্ণের মত অবিরত চঞ্চল হওয়া প্রাণের একমাত্র লক্ষণ নয়।

আমি পূর্ব্বেই বলেছি রাণীমার নাম হচ্ছে মীনাক্ষী দেবী। শ্যামাদাসী তাঁকে আজন্ম মীনা বলেই ডেকে এসেছে; এ বাড়ীতে এসে শুধু তার পিছনে রাণী জুড়ে দিয়েছে। কারণ গবর্ণমেণ্ট রায় মহাশয়কে রাজা খেতাব না দিলেও, এদেশের লোকে তাঁকে রাজা বাবুই বলত। সে যাই হোক্, আমি সখীরাণার প্রস্তাব শুনে একটু অসোয়াস্তি বোধ করতে লাগলুম। কেন না, আমি জানতুম যে, এই মজলিসে একজন উপস্থিত থাকবেন, যাঁর সুমুখে কি ব্যবহারে, কি কথাবার্ত্তায়, পান থেকে চূণ খসলেই সভাবন্ধ হবে।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম—তিনি কে?

ঘোষাল বল্লেন—তিনি এই রাজপুরীর পুরদেবতা।

—মানবী না পাষাণী?

—ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

সখী সমিতি

সন্ধ্যের পর রাত যখন ৮টা বাজে, পণ্ডিত মশায় আমার বাসায় এসে উপস্থিত হলেন, সঙ্গে রায় মহাশয়ের প্রিয় খানসামা রাধানাথ শিকদার। রাধানাথ আমাদের ঠাকুরবাড়ীতে নিয়ে চললো। বা'রবাড়ী এবং অন্দরমহলের মধ্যস্থ মহলটি হচ্ছে পূজার মহল। পশ্চিমে প্রকাণ্ড পূজার দালান, তার সুমুখে নাটমন্দির আর তিন

পাশে প্রশস্ত ভোগের দালান; সব আগাগোড়া সাদা মার্ব্বেলে মোড়া,—পবিত্রতার নিদর্শন।

আমাদের পথপ্রদর্শক আমাদের দুজনকে নিয়ে গিয়ে নাট-মন্দিরে একখানি গালিচার উপর বসালে। তাকিয়ে দেখি ঠাকুর-দালান স্ত্রীজাতি নামক উপদেবতায় গুলজার। শুনলুম এঁরা সবাই ব্রাহ্মণকন্যা,—রায় মহাশয়ের কুটুম্বিনী। আর দাসী-চাকরাণীরা বসেছে সব নাটমন্দিরের ডাইনে বাঁয়ে ভোগের দালানের বারান্দায়। প্রথমেই চোখে পড়ে এ দুই দলের বর্ণের পার্থক্য। যাক্‌, সে স্ত্রীরাজ্য আর বর্ণনা করব না, তাহলে পুঁথি বেড়ে যাবে। ছায়া পিছনে ফেলে আলোর দিকে ফিরে দেখি যে, ঠাকুরদালানের সামনে প্রথমেই বসে আছেন রাণীমা, তাঁর বাঁয়ে তাঁর তাম্বুলকরঙ্কবাহিনী সখীরাণী। রাণীমাকে এই প্রথম দেখলুম। দিব্যি সুশ্রী, যেন একটি ননীর পুতুল—

ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি
অবনী বহিয়া যায়।

মূর্ত্তিমতী আনন্দলহরী! এর চেয়ে তাঁর বিষয় বেশী কিছু বলবার নেই।

তাঁর ডাইনে বসে আছেন একটি বিধবা—the woman in white ইনিই হচ্ছেন এ পুরীর পুরদেবতা। তাঁর রূপ বাঙ্গালা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। কারণ এ তরল ভাষার কোন সংহত গাঢ়বন্ধরূপ নেই। সংস্কৃত কবি হয়ত বলতেন :—

"তড়িল্লেখা তন্বীং তপনশশি বৈশ্বানরময়ী।"

ঠাকুরাণী

এই সংস্কৃত বচন আউড়েই ঘোষাল বল্লেন—আর চার ড্রাম, liqueur glass-এ। এখন আমি সুর বদলে নেব, নইলে এ ইতিহাস কাব্য হয়ে উঠবে,—অর্থাৎ প্রলাপ। চার ড্রাম একটা বুড়ো আঙুলের মত গেলাসে এল; এক চুমুকে গেলাসটি খালি করেই ঘোষাল আবার তার গল্প আরম্ভ করলে :—

যে মহিলাটির রূপবর্ণনা করতে পারিনি, এখন তার গুণ বর্ণনা করি। তাঁর নাম ত্রিপুরাসুন্দরী, এ বাড়ীতে তিনি ঠাকুরাণী নামেই পরিচিত। তার কারণ তিনি রায় মহাশয়ের দ্বিতীয় পক্ষের শ্যালক হরিসত্য শর্ম্মা ঠাকুরের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। বিবাহের পর থেকে তিনি এই বাড়ীতেই বাস করছেন, বিদেহ আত্মার মত; কেননা তাঁর দেখাসাক্ষাৎ সকলে পায় না। অথচ তিনি হয়ে উঠেছেন এ পরিবারের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা। এরি নাম নীরব প্রভুত্ব। এক কথায়, সকলেই ছিল তার বশীভূত; হয়ত তাঁর রূপের জ্যোতিই ছিল তাঁর বশীকরণ-মন্ত্র, নয় ত তাঁর অন্তরের কোনও X-ray।

উপরন্তু তিনি ছিলেন বিদুষী। বিয়ের বছরখানেক পরে তাঁর স্বামীবিয়োগ হয়, তারপর থেকেই তিনি বিদ্যাচর্চ্চা সুরু করলেন। সংস্কৃত ভাষায় তিনি হয়ে উঠেছিলেন সুপণ্ডিতা। পণ্ডিত মহাশয় ছিলেন তাঁর শিক্ষক। তিনি বিধবার আচার 'ক' থেকে 'ক্ষ' পর্য্যন্ত অক্ষরে অক্ষরে পালন করতেন। যদিচ শাস্ত্রে তাঁর কোনরূপ ভক্তি ছিল না। পণ্ডিত মহাশয়ের কাছে শুনেছি,

কিছুদিন বেদান্তচর্চ্চা করে তিনি তাঁকে বলেন যে, ও আধ্যাত্মিক ধূমপানে আমার অরুচি হয়ে গিয়েছে। পণ্ডিত মহাশয় তখন বলেন যে, তবে কাব্যামৃত রসাস্বাদ করুন। তারপর থেকেই সুরু হল রামায়ণ, কালিদাস ও ভবভূতির চর্চ্চা। এ সব কাব্য ইতিহাস চর্চ্চা করেও তিনি তৃপ্তিলাভ করেন নি। তিনি নাকি বলতেন যে, যা' হওয়া উচিত তার কথা একরঙা, আর সে রঙও জলা। যা' হয়, তাই বিচিত্র। এর পর থেকে তিনি ইংরাজী শিখেছেন, আমিও পণ্ডিত মহাশয়ের অনুরোধে এ শিক্ষার কিছু সাহায্য করেছি। এই মেয়ে-মজলিসে তিনিই ছিলেন আমার গল্পের একমাত্র বিচারক। তিনি হাসলে, সকলে হাসতেন, তিনি গম্ভীর হলে সকলে গম্ভীর হতেন ;—শুধু সখীরাণী ছাড়া। কেন না ত্রিপুরাসুন্দরীর কাছে ছিল শ্যামাদাসীর সাত খুন মাপ। শুধু তাঁরা উভয়ে সমবয়সী বলে' নয়, কতকটা সহকর্ম্মী বলে'ও বটে।

প্রফেসর

তারপর মুখ ফিরিয়ে দেখি পাশে একটি মহা বেরসিক বসে রয়েছেন। তাঁকে দেখে একটু অসোয়াস্তি বোধ করতে লাগলুম।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম—ভদ্রলোকটি কে ?

—রায় মহাশয়ের তৃতীয় পক্ষের শ্যালক—নাম ভুজঙ্গেশ্বর ভট্টাচার্য্য, professor বলেই এখানে গণ্য ও মান্য। তিনি একজন ডবল M,A.,—প্রথম পক্ষে pure Mathematics এর, দ্বিতীয়

পক্ষে Mixed philosophyর। Mixed philosophy এই জন্য বলছি যে, তিনি হিন্দুদর্শন ও বিলেতীদর্শন তেলের সঙ্গে জলের মতন বেমালুম মিলিয়ে দিয়েছিলেন। সে মিশ্র দর্শন উজ্জ্বল নীলমণি ছাড়া আর কেউ গলাধঃকরণ করতে পারত না। এই অতিবিদ্বের ফলে তিনি সত্য কথা ছাড়া আর কিছু বলতেন না। সত্য কথা যে অপ্রিয় হতে পারে, তা আমরা সকলেই জানি। কিন্তু তাঁর বিশ্বাস ছিল যে, অপ্রিয় কথামাত্রই সত্য হতে বাধ্য, আর সে কথা যত অপ্রিয় হবে, তত বেশী সত্য হবে। ফলে তিনি একটি মহা ক্রিটিক হয়ে উঠেছিলেন,—প্রায় আপনারই জুড়ি। আমি একদিন রায় মহাশয়ের আড্ডায় গল্পচ্ছলে বল্লুম যে, কৃষ্ণ কদম তলায় একা দাঁড়িয়ে বাঁশী বাজাচ্ছিলেন, আর সেই বংশী ধ্বনি শুনে একদিক থেকে রাধিকা আর একদিক থেকে চন্দ্রাবলী ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে এলেন, তারপর পাঁচজনে মিলে মহা গণ্ডগোল বাধিয়ে দিলে। প্রফেসর অমনি নাক সিঁটকে মন্তব্য করলেন যে, দুই আর একে তিন হয়, পাঁচ হয় না। এ বিষয়ে দেখি রায় মহাশয় থেকে দেওয়ানজি পর্য্যন্ত সকলেই একমত। তখন আমি বল্লুম—শ্রীকৃষ্ণ যে একে তিন আর তিনে এক। আমার জবাব শুনে রায় মহাশয় বল্লেন "বহুত আচ্ছা!" ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কি একেবারে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর নন্?—তাই তাঁর লীলাখেলা হচ্ছে একদিকে সৃষ্টি আর একদিকে প্রলয়। প্রফেসর বল্লেন যে, একে তিন ধর্ম্মে হতে পারে, অঙ্কে হয় না। আমি বল্লুম— গণিতেও হয়, কেননা কৃষ্ণ হচ্ছেন বীজগণিতের X, তাঁকে বিন্দুও করা যায়,

তেত্রিশকোটিও করা যায়।—এর থেকে বুঝতে পারছেন তিনি কত বড় ক্রিটিক।

কথারম্ভ

সে যাই হোক, রাণীমার মুখপাত্র হয়ে সখীরাণী আদেশ করলেন যে, আজ একটি আজগুবি গল্প বল। প্রফেসর অমনি বলে' উঠলেন যে,—ঘোষাল মহাশয় যা' বলবেন, তাই আজগুবি হবে। আমি সখীরাণীকে সম্বোধন করে বল্লুম—শুনলেত, আমি যা' বলব তাই আজগুবি হবে, সেই ভরসায় আমি গল্প সুরু করছি। প্রফেসর একটু বিরক্ত হয়ে বল্লেন যে,—ঘোষাল যা বললে তা শুধু গল্পই হবে—অর্থাৎ গল্প হবে না। তার ভিতর দর্শন বিজ্ঞান কিছুই থাকবে না;—ওরকম গল্প একালে চলে না! এ যুগে কাব্য হচ্ছে শাস্ত্রের বেনামদার।

আমি বল্লুম—তা' যদি হয়ত পণ্ডিত মহাশয় গল্প বলুন, তার-পরে আমি শাস্ত্রচর্চ্চা করব।

এ কথা শুনে সখীরাণী খিল্ খিল্ করে' হেসে উঠলেন, সঙ্গে সঙ্গে আর সকলেও,—মায় ঠাকুরাণী। ফলে তাঁদের দন্তরুচি কৌমুদীতে আকাশবাতাসও হেসে উঠল।

তারপর সখীরাণী আবার আদেশ করলেন—এখন গল্প বল, কাল বৈঠকখানায় বসে তর্ক কর'।

আমি মনে করেছিলুম গল্প বলব "অচেতন প্রেমের।" কিন্তু বেগতিক দেখে শেষটা নেহাৎ বেপরোয়া গল্প সুরু করে দিলুম। তার পত্তন করলুম চীনদেশে। কল্পনাকে দিলুম সে দেশের ঘুড়ির

মত উড়িয়ে, আর সেই চীনে মাটির দেশের ফুল ফল ও নরনারীর বাঁকা চেহারার বর্ণনা করলুম। সে সবই এড়ো, সবই তেরচা চীনেদের চোখের মত। বলা বাহুল্য, প্রফেসর কথায় কথায় আমার ভুল ধরতে লাগলেন, Geography এবং Botany ইত্যাদির। অতঃপর আমি যখন বল্লুম যে, আমি বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষক হয়েত এখানে উপস্থিত হইনি, আমি এসেছি রূপকথা বলতে। রূপকথার রাজ্য ম্যাপে কোথায় আছে? আমার কথার রূপ আছে কিনা, তার বিচারক মা-লক্ষীরা ও স্বয়ং সরস্বতী।

কথার অপমৃত্যু

তারপর, আমি আমার চীনে নায়ককে উপস্থিত করলুম। নায়কের যেরকম রূপগুণ অলঙ্কার শাস্ত্রমতে থাকা উচিত, তার অবশ্য সে সব ছিল। তার চোখ ছিল, যে চোখ দিয়ে সে দেখতে পারত; কান ছিল, যে কান দিয়ে সে শুনতে পারত; আর যদিও চীনে, তবু তার নাক ছিল। নায়কের রূপবর্ণনা করবার পর আমার অপরাধের মধ্যে বলেছিলুম যে, সে চীনদেশের পাসকরা মুখস্থবাগীশ mandarinদের মত স্থূলদেহ ও স্থূলবুদ্ধির লোক নয়, একটি মানুষের মত মানুষ। এতেই হল যত গোল! প্রফেসর চটে উঠে বল্লেন যে,—"নিজে কখনো স্কুলকলেজে পড়নি বলে তুমি ফাঁক পেলেই বিদ্বান লোকদের বিদ্রূপ কর।" আমি একটু বেসামাল হয়ে বল্লুম, আমিও স্কুলে পড়েছি।

ঘোষালের ত্রিকথা

—কলেজে ?

—আজ্ঞে তাও।

—পাস ত কখনো করনি ?

—আজ্ঞে তাও করেছি।

—কি পাস করেছ ?

—M. A.

—কোন্ বিষয়ে ?

—প্রথমে Mixed Mathematics, পরে pure Philosophy.

—কোন্ বৎসর ?

—Calender-এ আমার নাম পাবেন না। ঘোষাল আমার ছদ্মনাম।

—চুরি করে জেলে গিয়েছিলে বুঝি ? বেরিয়ে এসে, পুনর্জন্ম লাভ করে' ঘোষাল রূপ ধারণ করেছ ?

—হয় ত তাই। আমি জাতিস্মর নই, পূর্ব্বজন্মের পাতা ওল্টাতে পারব না।

এর পরে তিনি লাফিয়ে উঠে বল্লেন যে—"আমি মিথ্যাবাদী ও চোরের সঙ্গে এক আসনে বসিনে।"

আমি বল্লুম—যদভিরোচতে।

উপসংহার

এর পরেই তিনি সরোষে চলে গেলেন। ঠাকুরাণী আদেশ দিলেন যে, আজকের মত সভা বন্ধ। পণ্ডিত মহাশয় আর আমি

ধীরে ধীরে বাসায় ফিরে এলুম। তিনি হয়ে গিয়েছিলেন অবাক, আর আমি নির্ব্বাক।

তারপর রাত যখন সাড়ে দশটা, সখীরাণী আমার ঘরে উপস্থিত হয়ে বল্লেন যে "ঠাকুরাণী আপনাকে ডাকছেন।" আমি জিজ্ঞাসা করলুম, এত রাত্তিরে কিসের জন্য?

—সে গেলেই বুঝতে পারবেন।

—তবু?

—শ্যালাবাবু রেগে রায় মহাশয়ের কাছে গিয়ে নালিশ করছে যে, তুমি ভদ্রমহিলাদের সামনে তাঁকে গায়ে পড়ে অপমান করেছ। রায় মহাশয় তাই শুনে মহা চটে,—তোমার উপর নয়, শ্যালাবাবুর উপর,—রাণীমার কাছে গিয়ে তাঁর ভ্রাতার উপর ঝাল ঝাড়ছিলেন। মীনারাণীও তোমার দিক নিলেন দেখে ক্ষণে রুষ্ট ক্ষণে তুষ্ট রায় উল্টা রেগে বল্লেন যে—"ঘোষালটাকে আজই বাড়ী থেকে বার করে দেব।" মীনারাণী বল্লে—"তার আগে একবার ঠাকুরাণীর মত জেনে নাও।" অমনি তিনি ঠাকুরাণীর মন্দিরে গিয়ে হাজির হলেন। তাঁর সঙ্গে অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা হল। ফলাফল ঠাকুরাণীর কাছেই শুনতে পাবে।

—আচ্ছা যাচ্ছি। তোমার রায় কি?

—ও রসিকতাটা না করলেই ভাল হত। প্রফেসরের যে অজীর্ণ বিদ্যায় মাথা ঘুরে গেছে তা' আমরা সকলেই জানি,—এমন কি মীনারাণীও। তার মত—তোমার কথা সত্যও হতে পারে, রসিকতাও হতে পারে। কিন্তু তুমি ওকথা বলে' ভালই করেছ।

মানুষের ধৈর্য্যেরও ত একটা সীমা আছে। এখন ঠাকুরাণীর মত কি, তা' তুমি তাঁর কাছে গেলেই শুনতে পাবে। আমি জানিনে।

আমি "আচ্ছা" বলে' আবার ঠাকুরবাড়ীতে ফিরে গেলুম, কারণ শুনলুম তিনি সেখানে আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। ঠাকুরাণী আমাকে আসন গ্রহণ করতে অনুমতি দিয়ে ধীরে শান্তভাবে বললেন :—

"আমার বিশ্বাস তুমি সত্য কথা বলেছ, কেননা তুমি যে কৃতবিদ্য, তা প্রত্যক্ষ। ছদ্মবেশ গায়ে যত সহজে পরা যায়, মনে তত সহজে নয়। মন জিনিষটে হাজার ঢাকতে চাইলেও যখন তখন বেরিয়ে পড়ে।

"তুমি বোধহয় জানো যে, মীনা আমার আত্মীয়। যখন দেখলুম যে বিপত্নীক রায় মহাশয়ের তৃতীয় পক্ষ করতে আর তর-সয় না, আর বাল্যবিবাহেও তাঁর আপত্তি নেই, বিধবা বিবাহেও নয়—তখন বাল্যবিধবাবিবাহরূপ যুগপৎ অধর্ম্ম থেকে তাঁকে রক্ষা করবার জন্য মীনাকে তাঁর হস্তে সমর্পণ করলুম। এ কাজ ভাল করেছি কি না জানিনে। সনাতন ধর্ম্মের বিধি নিষেধ সকলের পক্ষে ভাল হতে পারে, কিন্তু প্রত্যেকের পক্ষে নয়। কোন কোন রমণীর স্বধর্ম্ম হচ্ছে ফুটে ওঠা, আর শাস্ত্রের ধর্ম্ম হচ্ছে তাকে ফুটতে না দেওয়া। তাতেই এজাতীয় স্ত্রীলোকের জীবন হয় প্রাণহীন শরীরধারণ মাত্র। একথা অবশ্য ভূতেশ্বর বোঝে না। কারণ সে জীবনের মূলও জানে না, ফুলও জানে না। তার বিদ্যে হচ্ছে

জীবনের ভাষা ভুলে তার বানান শেখা। সে যাই হোক, তোমায় আজ শেষ রাত্তিরেই এখান থেকে চলে যেতে হবে। কাল সকালে যেন কেউ তোমার দেখা না পায়। এতে তোমারও মর্য্যাদা রক্ষা হবে, ভুজঙ্গেশ্বরেরও শিক্ষা হবে।

"রায় মহাশয় তোমার ছ' মাসের ছুটি মঞ্জুর করেছেন; পুরো মাইনের। তুমি যেখানে যাও, যেখানে থাকো, শ্যাম-দাসীকে চিঠি দিয়ে জানিয়ো, আর আমাদেরও যদি কিছু বলবার থাকে ত শ্যামদাসী তোমাকে জানাবে।

"দেখো, আমার বিশ্বাস কলেজ ছেড়ে, সংসারে ঢুকেই তোমার জীবনে কোন একটা ট্রাজেডি ঘটেছিল, আর সেই থেকে তোমার জীবনযাত্রার মোড় ফিরে গেছে। তুমি যে জীবনটাকে প্রহসন-রূপে দেখতে ও দেখাতে চাও, সে হচ্ছে ঐ ট্র্যাজেডির বাহ্য আবরণ মাত্র।

"আজ তবে এসো। শ্যামদাসী পরে তোমার সঙ্গে দেখা করবে।

আমি বাসায় ফিরে আসবার কিছুক্ষণ পরে শ্যামদাসী এসে যথেষ্ট টাকা দিয়ে বললে—"বিদেশে কখনো যদি কোন বিপদে পড়ো আমাকে জানিয়ো, ঠাকুরাণী তোমাকে সকল বিপদ থেকে রক্ষা করবে। তুমি চলে গেলে এ পুরী নিরানন্দ পুরী হবে।"

তারপর থেকেই তীর্থভ্রমণ করছি, অর্থাৎ নানা দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছি। পরশু শ্যামদাসীর একখানি চিঠি পেয়ে কাল কলকাতায় এসেছি। এদিকে শ্যামাদাসীও আজ উপস্থিত হয়েছেন। আজ

রাত্তিরের ট্রেনেই নাকি মকদমপুর রওনা হতে হবে। আমার সেখানে পদবৃদ্ধি হয়েছে, সে বাড়ীতে আমি এখন শিক্ষক নিযুক্ত হয়েছি। ঠাকুরাণীকে শেখাতে হবে ইংরেজী, সখীরাণীকে সঙ্গীত ও মীনারাণীকে অঙ্ক। ঠাকুরাণী এখন আয়ব্যয়ের হিসাব তাঁর কাছে বুঝিয়ে দিতে চান সেই জন্যই তাঁর তেরিজ খারিজ শেখা দরকার। দেখেছেন একবার qualificationএর কথা বলে' কি মুস্কিলেই পড়েছি। তাই আপনাকে জিজ্ঞেস করছিলুম যে, দেশের কাজ করতে গেলে কি qualificationএর প্রয়োজন?

—তোমার বিপদটা কি ঘটল, তা ত বুঝতে পারছি নে।

—একটি বালবিধবা আর একটি বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা, আর একটি স্বাধীনভর্তৃকা, এই তিনজনের ত্রি-সীমানায় ঘেঁষলে কি বিপদের সম্ভাবনা নেই? সখীরাণী ত আগেই বলেছে যে, আমার বুকের পাটা নেই। আমি ত আর Shelley নই যে, এ অবস্থায় Epipsychidion লিখে পরে ত্রি-রাণী সঙ্গমে ডুবে মরব।

—একটু ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে হয়ত দেখবে যে, এ তিনই এক।

—অর্থাৎ তড়িল্লেখা, তপন ও শশী তিনই এক,—অর্থাৎ আলো। কিন্তু ঐ তিনের মধ্যে এক যদি উপরন্তু বৈশ্বানরশ্রী হন?

—সখীরাণী ত আগেই বলেছে ঠাকুরাণী তোমাকে সকল বিপদ থেকে রক্ষা করবেন।

তারপর ঘোষাল বললে—তবে আসি, সখীরাণী অনেকক্ষণ আমার জন্য একা অপেক্ষা করছে।

ঘোষালের হেঁয়ালী

—কোথায় ?

—রাস্তায় Taxiতে।

তার পর ঘোষাল au revoir বলে' অন্তর্দ্ধান হলো।

শেষ পর্য্যন্ত আমি বুঝতে পারলুম না যে, ঘোষালের গল্পটি সত্য কিম্বা সর্ব্বৈব রসিকতা—অথবা অসম্বদ্ধ প্রলাপ। আপনাদের কি মনে হয় ?

বীণাবাই

সূত্রপাত

এ গল্প আমার ঘোষালের মুখে শোনা। এ কথা আগে থাকতেই বলে রাখা ভাল। নইলে লোকে হয়তো ভাববে যে, এ গল্প আমিই বানিয়েছি। কারণ ঘোষালের গল্পের যা প্রধান গুণ, ফূর্ত্তি—এ গল্পের মধ্যে তার লেশমাত্র নেই। এ গল্প বৈঠকী গল্প নয়, অর্থাৎ রায় মহাশয়ের বৈঠকখানায় বলা নয়;—আমার ঘরে বসে নিরিবিলি একমাত্র আমাকে বলা। কোন অবস্থায়,—বলছি।

আমি একদিন জনকতক বন্ধুকে আমার বাড়ীতে চায়ের নিমন্ত্রণ করি। আমার বন্ধুরা সকলেই সুশিক্ষিত ও গানবাজনার জহুরী। তাঁরা যে গাইয়ে-বাজিয়ে ছিলেন, তা' অবশ্য নয়; কিন্তু সকলেই সঙ্গীতশাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ। এর থেকে মনে ভাববেন না যে, তাঁরা সংস্কৃত ভাষায় লিখিত সঙ্গীতশাস্ত্রের সঙ্গে পরিচিত। তাঁরা তাঁদের শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করেছেন সেই সব নিরক্ষর মুসলমান ওস্তাদদের কাছ থেকে, যাঁরা সকলেই মিঞা তানসেনের বংশধর, আর এ বিদ্যে যাঁদের খানদানী।

আমি এ চা-পার্টিতে যোগ দিতে ঘোষালকে নিমন্ত্রণ করে-ছিলুম;—উদ্দেশ্য, বন্ধুবান্ধবকে ঘোষালের গান শোনানো। সেদিন সঙ্গীতশাস্ত্রেরই চর্চ্চা হল। ঘোষাল 'শরীর ভাল নেই' অজুহাতে

গান গাইতে মোটেই রাজী হ'লনা। ঘোষালের এই বে-রকম ব্যবহারে আমি একটু আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম। বন্ধুবান্ধবরা চলে গেলে পর ঘোষাল বললে,—"আমি গানবাজনার science জানিনে। জানি শুধু আর্ট। আর আমার বিশ্বাস এ ক্ষেত্রে science আর্ট থেকে বেরিয়েছে,— আর্ট science থেকে বেরোয়নি। হার্মোনিয়মের অতিরিক্ত ধ্বনি আছে, অর্থাৎ অতিকোমল অতি-তীক্ষ্ণ সুরও অবশ্য আছে। কিন্তু যা' গানের প্রাণ, তা' হচ্ছে অতীন্দ্রিয় সুর,—আর এই অতীন্দ্রিয় সুরের সন্ধান যিনি জানেন তিনিই যথার্থ আর্টিষ্ট। এই কারণেই আর্ট যে কি বস্তু, তা' বুঝিয়ে বলা যায় না। আর্টের অভিধানও নেই, ব্যাকরণও নেই। সেকেলে শাস্ত্রীরা গড়তেন ব্যাকরণ—অর্থাৎ বিধিনিষেধের ফর্দ। আর একেলে শাস্ত্রীরা লেখেন আর্টের অভিধান—অর্থাৎ ব্যাখ্যা।

কথারম্ভ

আমি বললুম,—"ঘোষাল, তোমার মতামত দার্শনিক হ'তে পারে, কিন্তু অবোধ্য। অনেক মাথা ঘামিয়ে বুঝতে হয়।"

ঘোষাল বললে—"আমার যা' মনে হ'ল, তাই বললুম। আমার কথা ঝুঁটো কি সাচ্চা, সে বিচার আপনারা করবেন। আমি নিজের অভিজ্ঞতা থেকে যে-সত্যের সাক্ষাৎ পেয়েছি, তাই শুধু বলতে পারি ও বলি।

এখন সঙ্গীতবিদ্যা সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতার কথা শুনুন। এ বিষয়ে আমার পটুতা একরকম অশিক্ষিত-পটুত্ব। আমি ছেলেবেলা

থেকেই গান গাইতুম, কেননা গেয়ে আমি আনন্দ পেতুম; আর শ্রোতারাও শুনে আনন্দিত হ'তেন। সেকালে আমি কোনরূপ শিক্ষার ধার ধারতুম না। এ বিষয়ে আমি ছিলুম শ্রুতিধর। একটি গান শোনবামাত্র তন্মুহূর্ত্তে পাঁচজনকে তা' শোনাতে পারতুম। এরি নাম বোধহয় প্রাক্তন সংস্কার। পৃথিবীতে যে-বস্তু আনন্দঘন —তা' স্বপ্রকাশ। ভাষায় এর ব্যাখ্যা করা যায় না। সঙ্গীতের একমাত্র ভাষা হচ্ছে সুর,—কথা নয়।

তারপর আমি যখন প্রব্রজ্যা গ্রহণ করি, তখন কাশীতে একটি বৃদ্ধ পূজারী ব্রাহ্মণের কাছে গান শিক্ষা করি—আমার কণ্ঠস্বরকে আয়ত্বে আনবার জন্য। বৃদ্ধ আজীবন শুধু পূজাপাঠ ও সঙ্গীতচর্চ্চাই করেছিলেন। গানের অন্তরে যে কি দিব্যভাব আছে, তার প্রথম পরিচয় পাই এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের প্রসাদে।

তারপর আমি এ বিদ্যা শিক্ষা করি স্বয়ং সরস্বতীর কাছে।"

আমি বললুম,—"ঘোষাল, কথা আজ তুমি বে-পরোয়া ভাবে বল্‌ছ।"

তিনি উত্তর করলেন,—সত্য কারও পরোয়া করে না। আমার আসল শিক্ষাগুরু হচ্ছেন একটি অলোকসামান্যা রমণী; আর তাঁর নাম হচ্ছে—বীণাবাই। তিনি বাইজী ছিলেন না। যে অর্থে মীরাবাই বাই, তিনিও সেই অর্থে বাই। তিনি ছিলেন শাপভ্রষ্টা দেবী সরস্বতী। কোথায় ও কি সূত্রে তাঁর সাক্ষাৎলাভ করি, তা' যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে বলছি।

বীণাবাই

সুরপুর

আমি এদেশে ওদেশে ঘুরে শেষটা বুন্দেলখণ্ডের একটি ছোট রাজার ছোট রাজধানী—সুরপুরে গিয়ে উপস্থিত হই। আমি একে ব্রাহ্মণ, তার উপর "গাবইয়া", তাই দু'দিনেই রাজাবাহাদুরের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলুম। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের কাছে শেখা জয়দেবের একটি গান,—"ধীর সমীরে যমুনাতীরে বসতি বনে বনমালী—" আমি রাজা বাহাদুরকে শোনাই। তা' শুনে তিনি মহা খুসী হলেন ও তাঁর সভাগায়ক রামকুমার মিশ্রের কাছে গান শিখতে আমাকে আদেশ করলেন। অবশ্য আমার খোরপোষের ব্যবস্থা তিনিই করে দেবেন বললেন।

মিশ্রজি ও-অঞ্চলের সর্ব্বপ্রধান গাইয়ে। তিনি করেন যোগ-অভ্যাস আর সঙ্গীতচর্চ্চা। গুরুজী ছিলেন অতি সদাশয় ও মহাপ্রাণ ব্যক্তি। রাজবাহাদুরের অভিপ্রায় অনুসারে তিনি আমাকে শিষ্য করিতে স্বীকৃত হলেন, এবং আমাকে তাঁর কাছে যেতে অনুরোধ করলেন। আমি তাঁর কাছে উপস্থিত হবামাত্র তিনি বললেন,—"প্রথমে তুমি আমার পালিত কন্যা বীণাবাইয়ের কাছে কিছুদিন শিক্ষা করো, তারপর আমি তোমাকে হাতে নেব। বীণাবাই শেষ রাত্তিরে উঠে জপতপ করেন, তারপর বীণা অভ্যাস করেন। সুতরাং প্রতিদিন প্রত্যূষে আমার বাড়ীতে হাজির হয়ো। আমি এ কয় বৎসর ধরে তাঁকে নিজে শিক্ষা দিয়েছি এখন তিনি আমার তুল্য গাইয়ে হয়ে উঠেছেন। সত্য কথা বলতে গেলে, আমার চাইতে তাঁর গলা ঢের বেশী নাজুক ও

সুরেলা। সেকণ্ঠ ভগবদ্দত্ত, সাধনালব্ধ নয়। সঙ্গীতশাস্ত্রে তিনি এখন পারদর্শী। সেইজন্যই তাঁর গান শাস্ত্রশাসিত নয়। যার ঐশ্বর্য্য আছে, সে কখনও বিধিনিষেধের দাস হ'তে পারে না। এ কথা স্বয়ং শুকদেব বলে গিয়েছেন ভাগবতে। অন্যকে শেখানো তাঁর কাজ নয়। কিন্তু আমার অনুরোধ তিনি রক্ষা করবেন।"

দেবীদর্শন

তার পরদিন আমি প্রত্যূষে রামকুমারের দ্বারস্থ হলুম। একটি দাসী এসে আমাকে তাঁর সঙ্গীতশালায় নিয়ে গেল। সেখানে গিয়ে দেখি, যিনি একটি রাঙ্কব আসনে উপবিষ্ট আছেন, তিনি স্বয়ং সরস্বতী;—তন্বী, গৌরী, বিগাঢ়-যৌবনা, শ্বেতবসনা। আর তাঁর কোলে একটি বীণা। এ সরস্বতী পাথরে কোঁদা নয়, রক্তমাংসে গড়া। আমার মনে হ'ল এ রমণী বাঙালী। কেননা তাঁর মুখেচোখে 'নিমক' ছিল; সংস্কৃতে যাকে বলে লাবণ্য। কোনও বৈষ্ণব কবি এঁর সাক্ষাৎ পেলে বলতেন,—'ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি অবনী বহিয়া যায়'; যে কথা কোনও হিন্দুস্থানী সুন্দরীর সম্বন্ধে বলা যায় না। আমাকে দেখে তিনি প্রথমে একটু অসোয়াস্তি বোধ করতে লাগলেন; যেন কোনও পূর্ব্বস্মৃতি তাঁর মনকে বিচলিত করেছে। মুহূর্ত্তে সে ভাবটা কাটিয়ে নিয়ে তিনি আমাকে হিন্দি ভাষায় প্রশ্ন করলেন,—"আপনি ব্রাহ্মণ?"

আমি বললুম,—"আমি ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেছি।"

এ কথা শুনে তিনি আমাকে নমস্কার করলেন। তারপর

বললেন—"আপনি একটী গান করুন, সে গান শুনে আমি বুঝব আপনি সঙ্গীত-প্রাণ কিনা।"

আমি একটি তম্বুরা নিয়ে "নৈয়া ঝাঁঝরি" বলে একটি আশাবরীর গান গাইলুম। এ গান আমার পূজারী ঠাকুরের কাছে শেখা। আমি গানটি সেদিন পূরো দরদ দিয়ে গেয়েছিলুম। একে বসন্তকাল, তার উপর উষার আলোক,—আর সুমুখে ঐ দিব্য-মূর্ত্তি। তাই মনের যত আনন্দ, যত আক্ষেপ আমার কণ্ঠে রূপধারণ করেছিল। মনে হ'ল, আমার গান শুনে তিনিও আনন্দিত হলেন।

তিনি বললেন,—আমি গুরুজীর আদেশ পালন করব। এর অর্থ এই নয় যে, আমি আপনাকে শিক্ষা দেব। আপনি নিজ চেষ্টায় শিক্ষিত হবেন।

আমি প্রশ্ন করলুম—এর অর্থ কি?

তিনি উত্তর করলেন,—আপনাকে সঙ্গীতসাধনা করতে হবে। একের সাধনায় অপরে সিদ্ধ হতে পারেনা। প্রত্যেককেই নিজে সাধনা করতে হয়। আমি শুধু আপনার কানে সঙ্গীতের মন্ত্র দেব। সে মন্ত্রের সাধন আপনাকেই করতে হবে। দেখুন,—হাত যন্ত্র বাজায় না, বাজায় প্রাণ; গলা গান গায় না, গায় মন। আর প্রাণকে উদ্বুদ্ধ করা ও মনকে প্রবুদ্ধ করারই নাম—সাধনা।

পরিচয়

পরমুহূর্ত্তেই দেবী মানবী হ'য়ে উঠলেন, এবং অসঙ্কুচিত চিত্তে আমাকে বললেন,—আপনি তো বাঙালী?

—হাঁ।

—বয়েস?

—পঁচিশ।

—শিক্ষিত?

—ইংরাজী শিক্ষিত।

—সংস্কৃত?

—কালিদাসের কবিতা আমাকে অলকায় নিয়ে যায়।

—এখানে কিজন্য এসেছেন?—বেড়াতে?

—না। পথই এখন আমার দেশ। আর পথ-চলাই এক মাত্র কর্ম্ম।

—তার অর্থ?

—আমি দেশত্যাগ করেছি।

—স্ত্রীপুত্র সব ফেলে এসেছেন?

—আমি অবিবাহিত।

—তা'হলেও, স্বদেশ স্বজনের মায়া কাটালেন কি করে?

—স্বেচ্ছায় কাটাইনি, কাটাতে বাধ্য হয়েছি।

—কেন?

—একটি নূতন মায়ার টানে পুরানো মায়ার সব বন্ধন ছিঁড়ে গিয়েছে।

—সঙ্গীতের মায়া?

—না। সঙ্গীতপ্রীতি আমার জন্মসুলভ। কিন্তু সঙ্গীতের মায়া কাউকেও উদ্‌ভ্রান্ত করে না, উন্মার্গগামী করে না।

এ কথা শুনে তাঁর মুখের উপর কিসের যেন ছায়া ঘনিয়ে এল। তিনি যুগপৎ গম্ভীর ও অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন। তাঁর মুখের ও মনের সে মেঘ কেটে যেতে মিনিট পাঁচেক লাগল। তারপর তিনি বাঙলায় এই ক'টি কথা যেন আপন মনে বলে গেলেন ;—স্বর সংযত ও আত্মবশ, আর মুখশ্রীও নির্বিকার।

বীণাবাইয়ের স্বগতোক্তি

আমিও বাঙালী। ব্রাহ্মণকন্যা এবং শিক্ষিতা। ইংরাজী ও সংস্কৃত উভয় ভাষার সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। আপনাকে আর কোনও প্রশ্ন করব না। আমার কৌতূহল অদম্য নয়। তা' ছাড়া জানি, আপনি সে সব প্রশ্নের উত্তর দেবেন না। আমার কোথায় বাড়ী, আমি কোন বৃন্তচ্যুত, সে সব বিষয়ে আপনিও আশা করি কোনও কথা জিজ্ঞাসা করবেন না। আপনারও নিশ্চয় বৃথা কৌতূহল নেই। এক বিষয়ে আমাদের উভয়ের মিল আছে। আপনাকে ও আমাকে দু'জনকেই "নইয়া ঝাঁঝরি"তে অর্থাৎ ফুটো নৌকাতে ভবসাগর পাড়ি দিতে হবে। এ যাত্রায় আমাদের একমাত্র সম্বল সুধু সঙ্গীত আর কাণ্ডারী, 'অবাঙ্‌মনসগোচর' কেউ।

যদিচ আমি আপনার চাইতে বছর চারেকের ছোট, তবুও এখন থেকে আপনাকে তুমি বলে সম্বোধন করব। কেন না আপনি আমার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন। আমি তোমাকে আমার সঙ্গীতসাধনার সতীর্থ করব। তাতেই হবে তোমার সঙ্গীতশিক্ষা।

আর এক কথা, অপরের সুমুখে আমার সঙ্গে বাঙলায় কখনো কথা কয়োনা। আর তুমি আমাকে 'বীণাবাই' ব'লোনা। কারণ, 'বাই' শব্দটা এদেশে সম্মানসূচক, কিন্তু বাঙালীর মুখে জুগুপ্সিত। তাই তুমি আমাকে "বীণা বেন" বোলো। বোধহয় জান, 'বেন' বোহিনের অপভ্রংশ। না, না, তোমার কাছে আমি "বীণা বেন"ও নই,—আমি বীণা সেন। এ নামের সার্থকতা এই যে আমি তানসেনের স্বজাত

এই কথা বলেই তিনি একটু বক্রহাসি হাসলেন। আমি বুঝলুম, তিনি যথার্থই বাঙালীর মেয়ে;—প্রকৃতিসরলা, ও বুদ্ধিমতী। আর তার আলাপ, নর্ম্মালাপ;—অর্থাৎ লীলা-চতুর ও সবিভ্রম।

সুরপুর ত্যাগ

তারপর বছরখানেক ধরে বীণাবাই আমার কানে সঙ্গীতমন্ত্র দিলেন—অর্থাৎ তাঁর সঙ্গীতসাধনায় আমাকে দোসর করে নিলেন: আমি হলুম সঙ্গীত-সাধক আর তিনি উত্তরসাধিকা। কোনও একটা রাগ তিনি প্রথমে বীণে আলাপ করতেন, পরে কণ্ঠে। আর আমি যথাসাধ্য তাঁর অনুসরণ করতুম। এ শিক্ষা একরকম প্রদীপ থেকে প্রদীপ ধরিয়ে নেওয়া। আমি পূর্ব্বে বলেছি এরকম অপূর্ব্ব গান আমি জীবনে কখনো শুনিনি। আপনি মৃচ্ছকটিক নিশ্চয়ই পড়েছেন। চারুদত্ত ভাবরেভিলের গান শুনে যা বলেছিলেন, বীণাবাইয়ের গান সম্বন্ধে তাই বলা যায়:—

বীণাবাই

তং তস্য স্বরসংক্রমং মৃদুগিরঃ শ্লিষ্টং চ তন্ত্রীস্বনং
বর্ণানামপি মূর্চ্ছনান্তরগতং তারং বিরামে মৃদুম্‌।
হেলাসংযমিতং পুনশ্চ ললিতং রাগ দ্বিরুচ্চারিতং
যৎ সত্যং বিরতেঽপি গীতসময়ে পশ্যামি শৃণ্বন্নিব॥

সে বৎসরটা ছবি ও গানের লোকে দিবাস্বপ্নের মত আমার কেটে গেল—কেননা বীণাবাই ছিলেন একাধারে চিত্র ও সঙ্গীত।

তারপর গুরুজী একদিন অকস্মাৎ ইহলোক ত্যাগ করলেন। লোকে বললে, যোগীর যা হল, তা ইচ্ছামৃত্যু;—আমরা যাকে বলি sudden heart-failure। গুরুজী তাঁর সর্ব্বস্ব বীণাবাইকে দিয়ে গিয়েছিলেন। বীণা বিষয়সম্পত্তি সব গুরুজীর ভাই হরি-কুমার মিশ্রকে প্রত্যর্পণ করলেন; শুধু রাজকোষে তাঁর নিজের যে টাকা মজুত ছিল, তাই নিতে রাজী হলেন;—গুরুজীর ইচ্ছামত কাশীতে একটি সরস্বতীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করবার অভি-প্রায়ে। তিনি আমাকে বললেন,—তোমাকেও আমাদের সঙ্গে যেতে হবে। আমি তোমার উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর করি; আর জানই ত কারও না কারও উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করাই হচ্ছে স্ত্রী-ধর্ম্ম। আমি অবশ্য তাঁর সহযাত্রী হতে স্বীকৃত হলুম। কেন না তাঁর প্রতি আমার ছিল পরাপ্রীতি—নামান্তরে ভক্তি।

কাশীবাস

কাশীতে আমাদের সঙ্গী ছিলেন বসন্তরাও মৃদঙ্গী, হরিকুমারজী (কাকাবাবু), হিম্মত সিং ও ত্রিবেণী সিং—সুরপুরের রাজবাড়ীর দুজন বিশ্বস্ত রক্ষী—ও বীণার সেই বুন্দেলখণ্ডী দাসীটি।

সেখানে গিয়ে দেখা গেল যে, একটি সরস্বতীর মূর্ত্তি গড়তে ও মন্দির তৈরী করতে যে টাকা লাগবে, বীণাবাইয়ের তা নেই। তখন কাকাবাবু প্রস্তাব করলেন যে, তিনি ও বীণাবাই দুজনে সঙ্গীত-রসিকদের গানবাজনা শুনিয়ে নাজাই টাকা রোজগার করবেন। হরিকুমারজী ছিলেন একজন অসাধারণ ওস্তাদ। তাঁর যন্ত্র রুদ্রবীণা নয়—ক্ষুদ্র সেতার। তিনি করেছিলেন গানের নয়, গতের সাধনা এবং এ বিষয়ে তাঁর ছিল অসাধারণ কৃতিত্ব। গুরুজী বলতেন—ভাইসাহেব সঙ্গীতের প্রাণের সন্ধান করেন নি, কিন্তু তার বহিরঙ্গ সম্পূর্ণ আয়ত্ত করেছেন। তাই তার সঙ্গীতে শক্তি আছে, শ্রী নেই; তান আছে, প্রাণ নেই। যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী। ওস্তাদমহলে তাঁর পায়ে সকলেই নিজের মাথার পাগড়ি রেখে দিত।

ঠিক হল,—তাঁরা কারও বাড়ী গাইতে বাজাতে যাবেন না। লোকে তাঁদের যথেষ্ট দক্ষিণা দিয়ে তাঁদের বাড়ী এসে বীণার গান ও ভাইসাহেবের সেতার শুনে যাবে। বীণাবাই হপ্তায় একদিন শুধু রবিবারে দর্শন দেবেন। কিন্তু এ ব্যবসা খুলতে হবে কাশীতে নয়—কলকাতায়; কেননা বাঙ্গালীরা সঙ্গীতের জন্য মেহন্নত করে না, কিন্তু পয়সা খরচ করে। বসন্তরাও কলকাতায় গিয়ে একটি সরু গলির ভিতর একটি পুরোনো প্রাসাদ ভাড়া নিলেন, যার সংলগ্ন কতকগুলো একতালা ছোট ছোট কামরা ছিল; বোধ হয় সেকেলে কোন ধনী ব্যক্তির আমলাদের থাকবার ঘর। আমরা সদলবলে সেই বাড়ীতে

এসে আড্ডা গাড়লুম ও ব্যবসা খুললুম। পয়সাও বেদায় আসতে লাগল। শ্রোতারা হল দুদল—অর্থাৎ যারা সঙ্গীতের স'ও জানে না, অথচ সঙ্গীতের মুরুব্বি; আর অপর দল—যারা সেতার পিড়িং পিড়িং করতে পারে আর শাস্ত্রের বুলি আওড়ায়। মুরুব্বিরা মুগ্ধ হত বীণার গান শুনে না হোক, ছবি দেখে; আর গুণধররা অবাক হত সেতারীর তরল অঙ্গুলির বিচিত্র লীলা দেখে। তিনি যার সাধনা করেছিলেন—সে সেতারের হঠযোগ।

বীণার যাত্রাভঙ্গ

মাসখানেক পরে একদিন রবিবার সন্ধ্যায় আমরা পগ্‌গধারীর দল আসরে বসে আছি, আর বীণাদেবী আমাদের মধ্যে নিবাত-নিষ্কম্প প্রদীপের মত বিরাজ করছেন। একটু দূরে জনকতক গুণী ও ধনী শ্রোতা বসে আছেন। বসন্তরাও তখন মৃদঙ্গে মেঘ ডাকাচ্ছেন, হাতের কলকজ্জা সব খেলিয়ে নেবার জন্য। এমন সময় হিম্মত সিং নীচে থেকে উপরে এসে বললে,—পাশের বাড়ীতে একটি বাবুর ভারি অসুখ, তিনি বলে পাঠিয়েছেন যে মেহেরবানি করে গান-বাজনা যদি বন্ধ করেন, তাহলে তিনি একটু ঘুমোতে পারেন। এ কথা শুনে শ্রোতাদের ভিতর থেকে একজন স্থূলকায় ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ধনী বলে উঠলেন—"তিনি মরুন আর বাঁচুন, আমাদের আনন্দোৎসব চলবে।" এই নিষ্ঠুর কথা শুনে বীণাদেবী আগুন হয়ে উঠলেন ও আমাকে হুকুম করলেন—"ঘোষাল, তুমারা পাগড়ি উতারো আওর নীচু যাকে পুছকে

আও—বাঙ্গালী লোক কেয়া মাঙ্গতা। বাঙ্গলা বোলনেকো তুমারা আদত হ্যায়।" আমি তখনই আমার পাগড়ি বসন্তরাওয়ের হাতে দিয়ে নীচে নেমে গেলুম; আর পাঁচ মিনিটের মধ্যে ফিরে এলুম। বীণাদেবী হুকুম করলেন "বাঙ্গলামে বোলো সবকোই সমঝেগা।" আমি বললুম—"প্রার্থনা ভদ্রলোক আপনাকে জানাবেন, কেননা আপনি স্ত্রীলোক—আমাদের উপর তাঁর ভরসা নেই। এই পাশের একতালা বাড়ীর ভাড়াটেবাবু নাকি সাংঘাতিক ব্যারামে ভুগছেন। উপরের গান-বাজনা নীচের রোগীর কানে অসহ্য গোলমালের মত ঠেকছে।" একথা শুনে বীণাদেবী বললেন—"ঘোষাল, তুমি সামনের ফটক দিয়ে যাও, আমি পাশের সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাচ্ছি।" সেই আমলা বাবুটির সঙ্গে আমিও সেখানে উপস্থিত হলুম, পিঠপিঠ অন্য সিঁড়ি দিয়ে বীণাদেবীও নেমে এলেন। তারপর যা ঘটল, যে অদ্ভুত কাণ্ড;—যা গল্পে মধ্যে মধ্যে হয়, জীবনে নিত্য হয় না। কারণ কথার অঘটনঘটনপটীয়সী শক্তি অসীম।

নটবরের নিবেদন

বীণাদেবীকে দেখবামাত্র সেই আমলাবাবুটি "কে, দিদিমণি?" —বলে তাঁকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করে তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে কপালে ঠেকালেন।

বীণাও গদ্গদ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন—নটবর চট্টরাজ, কার অসুখ?

বীণাবাই

—বড় বাবুর।

—কি, দাদার ?

—আজ্ঞে তাঁরই !

—রোগ কি ?

—ডাক্তাররা ত বলেন, এ রোগে লোক আজ আছে কাল নেই।

—এখানে কেন এসেছ ? বড়বাবুর চিকিৎসার জন্য ? সঙ্গে কে আছে ?

—পুরোনো চাকর বাকর, আমি আর বড়বৌঠাকরুণ।

—বৌঠান কোথায় ?

—এই পাশের ঘরে আছেন।

বীণা এ কথা শুনে আমাকে বললেন, "ঘোষাল, উপরে যাও ও কাকাবাবুকে বলো শ্রোতা-বাবুদের সব বিদায় করে দিতে—আর তাদের টাকাকড়ি সব ফিরিয়ে দিতে। তুমি যাবে আর আসবে।" আমার মনে হল তিনি দুরন্ত চিত্তচাঞ্চল্য সামলে নেবার জন্য মুহূর্তের জন্য আমাকে সরিয়ে দিলেন। আমি তাঁর আদেশ হরিকুমারজীকে জানিয়ে, সেই সরু সিঁড়ি দিয়ে আবার নেমে এলুম। দেখি বীণাদেবী যেখানে ছিলেন, সেখানেই দাঁড়িয়ে আছেন চিত্র-পুত্তলিকার মত। মনে হল—দুঃখে ও লজ্জায় তিনি অভিভূত হয়ে পড়েছেন। আমি আসবামাত্র তিনি বললেন —"চল বড়বৌর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আসি—আমার একা যেতে সাহস হচ্ছে না। ভাল কথা, ব্যাপার দেখে ও শুনে তোমার কি মনে হচ্ছে ?"

ঘোষালের ত্রিকথা

—"আমার মনে হচ্ছে—নীচে অন্ধকার,উপরে আলেয়ার আলো ; নীচে রোগ-শোক, উপরে নাচ-গান। এরি নাম সুবিন্যস্ত সমাজ।"

বীণা এ কথা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। তারপর বললেন—"যাও নটবর, বৌঠানকে গিয়ে বল যে দোতালার 'বিবিজি' আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।"

বীণার স্বজন

ঘরে ঢুকতেই চোখে পড়ল, সুমুখে একটি শ্বেতপাথরের প্রতিমা দাঁড়িয়ে আছেন—প্রায় আমার মত লম্বা ; পরণে একখানি লাল-পেড়ে উজ্জ্বল গরদের শাড়ী, বীণাদেবীর ধাঁচেই সুমুখে কোঁচা ও বাঁ কাঁধে আঁচল দিয়ে পরা। এ মূর্ত্তি জমাট অহঙ্কারের মূর্ত্তি ; আর সে অহঙ্কার যেমন দৃপ্ত তেমনি দীপ্ত। বীণাকে দেখে তিনি একটু চম্‌কে উঠলেন। পরমুহূর্ত্তে বীণা যখন তাঁকে প্রণাম করতে অগ্রসর হল, তখন তিনি বললেন—"আমাকে ছুঁয়ো না, কেননা ছুঁলে আবার স্নান করতে হবে।

বীণা দু'পা পিছু হটে বললে—আমাকে চিন্‌তে পারছ না ?

—না। কে তুমি ?

—বীণা।

—কোন বীণা ?

—তোমার ননদ বীণা।

—আমার ত কোনও ননদ নেই। সে বীণা মরে গিয়েছে।

—আমি মুহূর্ত্তের জন্য ভুলে গিয়েছিলুম যে, আমি এখন

তোমার কাছে অস্পৃশ্য। বহুকালের অভ্যাসের দোষে প্রণাম করতে উদ্যত হয়েছিলুম। যাক্ এ সব কথা। এ বাড়ীতে কার অসুখ?

—আমার স্বামীর।

—কি অসুখ?

—Heart-disease,

—কেমন আছেন?

—খানিকক্ষণ আগে বুকে ভয়ঙ্কর ব্যথা ধরেছিল। এখন একটু ভাল। তবে ডাক্তাররা বলেন, angina বড় treacherous।

—এখানে এসেছ বুঝি বড়বাবুর চিকিৎসার জন্য?

—লোকে বলে—শ্মশান পর্যান্ত চিকিৎসা।

—এ গোয়ালে উঠেছ কেন?

—চৌরঙ্গীতে বাড়ী ভাড়া করবার সামর্থ্য নেই বলে। এখন বড়বাবু নিঃস্ব।

—তোমরা নিঃস্ব!—তোমাদের জমিদারী ত একটা খণ্ডরাজ্য।

—তালুক-মুলুক সব বিক্রী হয়ে গিয়েছে।

—কিসে?

—দেনার দায়ে।

—তোমাদের ত ঋণ ছিল না।

—যা আগে ছিল না, এমন অনেক জিনিষ ইতিমধ্যে হয়েছে।

—যেমন তোমার ননদের মৃত্যু।

—হাঁ; আর তার পিঠপিঠ ঋণ।

ঘোষালের ত্রিকথা

—আমার মৃত্যুর সঙ্গে দাদার ঋণের কি সম্বন্ধ ?

—ভগ্নীর মৃত্যুর পরেই দাদা ঘোর বদান্য হয়ে উঠলেন। বাঙলায় যত সদনুষ্ঠানে দু'-হাতে দান করতে লাগলেন; আর তার জন্য ঋণ করতে সুরু করলেন। বাঙলায় ত সদনুষ্ঠানের অভাব নেই; আর এ শ্রাদ্ধের অগ্রদানীরও অভাব নেই।

—ঋণ কেন ?

—আমরা ত সা-মহাজনের বংশে জন্মাইনি। তহবিলে মজুত টাকা ছিলনা বলে।

—আচ্ছা বড়বাবু ত নিঃস্ব হয়েছেন। ছোটবাবু ?

—তিনি এখন জেলে।

—খোকা জেলে ?

—ছোটবাবুর কাছে revolver ছিল বলে' সরকার তাকে intern করেছে। কিন্তু সে ভুল করে। কেননা ছোটবাবু revolver সংগ্রহ করেছিলেন মাষ্টার মহাশয়ের দেখা পেলে তাঁকে গুলি করবে বলে।

—তারও কোন আবশ্যক ছিলনা। মাষ্টার মহাশয়কে তাঁর হিন্দুস্থানী চেলার দল অনেকদিন হ'ল গুলি করেছে।

—কেন, তাদের তিনি কি সর্ব্বনাশ করেছিলেন ?

—কিছু করেন নি, কিন্তু সর্ব্বনাশ করবেন এই ভয়ে।

—এই ভয়ের কারণ কি ?

—তিনি নাকি আসলে পুলিসের গোয়েন্দা—এই সন্দেহের

জন্ম। বোধহয় এ সন্দেহের মূল ভয়। তিনি অতিমানুষ না হলেও অমানুষ ছিলেন না।

—রাখো রাখো—তাঁর হয়ে ওকালতি। এখন বুঝছি ছোট-বাবুকে কে ধরিয়ে দিয়েছে। তিনিই ত ছোটবাবুর কানে বিপ্লবের মন্ত্র দিয়েছিলেন। তিনি আর কিছু না করুন, আমাদের পরিবারে সবদিক থেকেই বিপ্লব ঘটিয়েছেন।—তারপর বীণার কি হল ?

বীণার জের।

—সে আজও বেঁচে আছে।

—আর বাইজীর ব্যবসা নিয়েছে?

—হাঁ, তাই।

—টাকার অভাবে ?—তার ত যথেষ্ট টাকা নটবরের জিম্মায় আছে। একখানি পোষ্টকার্ড লিখলে, পত্রোত্তরে সে তা' পেত। আমরা ত জানো তার স্ত্রীধন ছোঁব না,—মরে গেলেও নয়।

—তার টাকার অভাব নেই।

—তবে সখ।

—ধরে নেও তাই।

—বলিহারি যাই বীণার সখের। সুন্দরী, যুবতী, বিধবা ব্রাহ্মণকন্যার চমৎকার ব্যবসা। ধিক তার শিক্ষাদীক্ষায় !

—বীণা বিধবা নয়।

—এর অর্থ কি ?

—সেন মহাশয়ের সঙ্গে তার কখনো বিবাহ হয়নি।

ঘোষালের ত্রিকথা

এ কথা শুনে বৌঠাকুরাণী আমার প্রতি কটাক্ষ করে জিজ্ঞেস করলেন—ইনি কে ?

—আমার গুরু-ভ্রাতা।

—কিসের গুরু ?

—সঙ্গীতের। গুরুজীর মৃত্যুর পর ইনি আমার স্বেচ্ছাসেবক হয়েছেন।

—অজ্ঞাতকুলশীল ?

—না। ব্রাহ্মণসন্তান। আর শীল ?—এঁর দেহমনে পশুত্বের লেশমাত্র নেই।

এই কথা শুনে সেই ঋজুদেহ পাষাণ-প্রতিমা নুয়ে আমাকে নমস্কার করলেন। আমিও প্রতিনমস্কার করলুম। তারপর বৌঠান বীণাকে বললেন—তুমি সধবাও নও, বিধবাও নও, পুনর্ভূও নও। তবে তুমি কি ?

বীণার আত্মকথা

বীণা উত্তর করলে—বলছি। ঘোষাল, তুমিও শোনো। তার-পর ঈষৎ ইতস্ততঃ করে বললেন—আমি কুমারী।

—কুমারী ?

—অনাঘ্রাত পুষ্প।

—তুমি !

—হাঁ, আমি। মাষ্টার মহাশয়কে কখনো স্পর্শ করিনি, স্বপ্নেও নয়।

—অর্থাৎ তুমি কুলত্যাগ করেছ, কিন্তু জাত বাঁচিয়েছ ?

—ব্রাহ্মণত্বের অহঙ্কার তোমার মত আমারও আছে ; কিন্তু জাতিধর্ম্মে আমার ভক্তিও নেই, ভয়ও নেই।

—তোমার কথা বিশ্বাস করিনে। তুমি বলতে চাও—তোমার দেহ রক্ত-মাংসে গঠিত নয় ?

—তুমি পাষাণে গড়া হতে পারো, কিন্তু আমি সুধু রক্তমাংসে গড়া ;—জীবন্ত রক্তমাংসেরও রুচি-অরুচি আছে। প্রবৃত্তি যেমন স্বাভাবিক, অপ্রবৃত্তিও তেমনি স্বাভাবিক। প্রবৃত্তি অবশ্য দমন করা যায়, কিন্তু অপ্রবৃত্তি দমন করবার যদি কোনও সদুপায় থাকে, তা আমার জানা নেই।

এ কথা শোনবার পর বৌঠাকুরাণী মুষড়ে গেলেন। তাঁর ভাবান্তর ঘটল ; তাঁর মুখ থেকে তাচ্ছিল্যের বজ্র-লেপের মুখোস যেন খসে পড়ল। তিনি বললেন—বীণা, তোমার শরীর কেমন আছে ?

—ভালই।

—তোমারও না heart একটু বিগড়েছিল ?

—সেটুকু বেগ্‌ড়ানো এখনও আছে। মাঝে মাঝে palpitation—এখনও হয়। ও-বস্তু একবার বেগ্‌ড়ালে মেরামত করা যায় না। এই খানিকক্ষণ আগে বুক বেজায় ধড়াস্ ধড়াস্ করছিল ; এখন হৃৎপিণ্ডটা আর ততটা লাফাঝাঁপি করছে না, তাই যাই দাদাকে দেখে আসি। ঘোষাল, তুমি উপরে যাও। আমার দলবলকে এখনই দেশে ফিরে যেতে বলো। আর কাকাবাবুকে

বলো যে, তাঁর কাছে আমার যে টাকাকড়ি আছে; তা তাঁকেই দিলুম। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে বাড়ী খালি করা চাই। 'আচ্ছা' বলে আমি উপরে গেলুম, আর বীণা তাঁর দাদার শোবার ঘরে গেলেন। বৌঠান কোন বাধা দিলেন না।

দলবল বিদায়

আমি উপরে গিয়ে হরিকুমারজি ওরফে কাকাবাবুকে বীণার ইচ্ছা জানালুম। বীণা তাঁর সমস্ত টাকা হরিকুমারজিকে দান করেছেন শুনে তিনি অবাক হয়ে গেলেন—সে যে অনেক টাকা। তারপর তিনি একটু ভেবে বললেন, বাঈজির ইচ্ছা পূর্ণ করব। ঐ টাকা দিয়ে আমি সুরপুরে সরস্বতীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করব। তারপর ঘণ্টাখানেকের মধ্যে তাদের সব জিনিষপত্র নিয়ে হাবড়া ষ্টেশনে তারা চলে গেল; রেখে গেল সুধু বীণার বীণা, আর তার সুসজ্জিত শোবার ঘরের জিনিষপত্র—আমার জিম্মায়। তারপর আমাদের ঠিকা চাকরকে দিয়ে ঝাঁট দিয়ে ঘরদোর সব সাফ-সুত্‌রো করে রাখলুম। কারণ জানতুম বীণা দেবী ময়লা চক্ষে দেখতে পারেন না,—এমন কি দেয়ালের কোণে এক টুকরো ঝুলও নয়।

ঠিক সাড়ে নটার সময়, নটবর চট্টরাজ উপরে এসে জিজ্ঞাসা করলে—ঘরদোর ত সব খালি ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন? আমি বললুম—চোখেই ত দেখতে পাচ্ছেন। তিনি বললেন—বড়বাবুকে আমরা উপরে নিয়ে আসব। ডাক্তারবাবু তাঁকে নড়বার অনুমতি দিয়েছেন—এবং এখনও হাজির আছেন।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম—বড়বাবু এখন কি রকম আছেন? নটবর বললে,—ডাক্তারবাবু বলেন, আজকের ফাঁড়া কেটে গেছে। আপনিও আসুন, আমাদের একটু সাহায্য করতে হবে। আমি বললুম—বেশ। নটবর বললে,—আমার কাছে দিদিমণির বিস্তর টাকা আছে। দিদিমণি সে টাকা আপনাকে দিতে বলেছেন।

—আমাকে?

—হাঁ আপনাকে, বড়বাবুর চিকিৎসার খরচ চালাতে। খরচ আমিই দেব, ও তার হিসেব রাখবো। টাকাকড়ির ঝক্কি দিদিমণি আর পোয়াতে পারবেন না। তা ছাড়া পৈতৃক ধন ভাইয়ের জন্য ব্যয় হবে,—এতো হবারই কথা। বিশেষতঃ বড়বাবু দেবতুল্য লোক। বড়মানুষের ঘরে এমন পুণ্যের শরীর দেখা যায় না। আর দিদিমণির তিনি ত শুধু ভাই নন—উপরন্তু শিক্ষা গুরু। ওঁরা দুজনে অভিন্ন হৃদয়।

আমরা পাঁচজনে ধরাধরি করে খাটশুদ্ধ বড়বাবুকে উপরে নিয়ে এলুম, গঙ্গা-যাত্রীর মত। বড়বাবুকে এই প্রথমে দেখলুম। অতি সুপুরুষ। মুখে রোগের চিহ্নমাত্র নেই, আছে শুধু আভিজাত্যের ছাপ। তাঁর সঙ্গে এলেন ডাক্তারবাবু, আর বীণা দেবী; বৌঠানও এলেন—যদিচ তিনি প্রথমে একটু ইতস্ততঃ করেছিলেন।

চাকর-বাকর প্রথমেই চলে গিয়েছিল; শেষে ডাক্তারবাবুও 'আর ভয় নেই' বলে বিদায় হলেন। একটা টিপায়ের উপর

হু'টো ওষুধের শিশি রেখে গেলেন ;—একটি বড়বাবুর জন্য অপরটি বীণা দেবীর জন্য। দুটিই heart-tonic, কিন্তু এক ওষুধ নয়।

বীণা বল্‌লেন—আমর ওষুধটা আমার ঘরে রেখে এসো ; পাছে ভুল করে একের ওষুধ অন্যকে খাওয়ানো হয়। আজ আমাদের মাথার ঠিক নেই। আর আমার বীণাটা নিয়ে এসো। আজ আমাদের শিবরাত্রি, তোমারও। সমস্ত রাত্রি উপবাস ও জাগরণ। আমি ওষুধটা রেখে বীণাটি নিয়ে এলুম। বীণা বললেন—দাদা, তোমাকে ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছি বীণার মৃদু গুঞ্জনে। তারপর বৌঠানকে জিজ্ঞাসা করলেন—কি রাগ আলাপ করব ? তিনি উত্তর করলেন—ঝিমন্ত পরজ। বীণা একটু হেসে বল্‌লে,—তুমি ত গানবাজনায় আমার সর্ব্বপ্রথম শিক্ষয়িত্রী ; মন দিয়ে শোনো, তালের হস্বিদির্ঘি ও সুরের যত্বণত্বের জ্ঞান আমার হয়েছে কিনা। এ বিষয়ে spelling mistakes ত তোমার কান এড়িয়ে যাবে না।

তারপর বীণা বীণায় পরজ আলাপ করলেন—অতি মৃদুস্বরে, অতি বিলম্বিত লয়ে। এমন বাজনা আমি জীবনে আর কখনো শুনিনি। বীণার অন্তরে যে এত কাতরতা, এত বৈরাগ্য থাক্‌তে পারে, তা আমি কখনো ভাবিনি। আধ ঘণ্টার মধ্যেই বড়বাবু ঘুমিয়ে পড়লেন।

বৌঠান বললেন—বীণা, তোমার সাধনা সার্থক ! বীণা বললেন—বৌঠান, তুমি দাদাকে পাহারা দেও। আমি ভিতরে

যাচ্ছি, ঘোষালের সঙ্গে একটু হিসেব-কিতেব করতে। ঘোষাল হচ্ছেন আমার নটবর—অর্থাৎ খাজাঞ্চি।

বীণার ফিলজফি

ভিতর বাড়ীর বারান্দায় যাবামাত্র বীণা বললেন—"মনে আছে, আজ আমাদের শিবরাত্রি—অর্থাৎ নির্জ্জলা উপবাস ও নির্নিমেষ জাগরণ। সমস্ত রাত্রি জোড়াসন হয়ে বসে থাকতে পারব না, পিঠ ধরে আসবে। তুমি খানিকক্ষণ আগে বলেছিলে যে সমাজের একতলায় অন্ধকার আর দোতলায় আলেয়ার আলো। কথাটা খুব ঠিক। তবে একতলা মনে করে দোতলা স্বর্গ, আর দোতলা ভাবে একতলা নরক। দুটোই সমান illusion। আমি কিন্তু দোতলার জীব। তাই আমার চাই আলো আর বাতাস, আর চাই পিঠে আশ্রয়, বুকে আঁচল আর মুখে সাধুভাষা অর্থাৎ সাধুর ভাষা। আরও অনেক জিনিষ চাই, যার ফর্দ্দ দিতে গেলে রাত কেটে যাবে। জানি এ সবই কৃত্রিম। তাতে কি যায় আসে!—আমাদের জীবন, সমাজ ও সভ্যতা সবই কি কৃত্রিম নয়?—সে যাই হোক, আমার ঘর থেকে দুখানা cushion-chair নিয়ে এসো।"

আমি একখানির পর আর একখানি গদি-মোড়া চেয়ার নিয়ে এলুম, যাতে বসে আরাম আছে। তারপর বীণা বললেন,—"চুপ করে কি জাগা যায়? বিশেষতঃ মন যখন অশান্ত। ভাল কথা—বিলেতি দেহতত্ত্ব আর মনস্তত্ত্ব নিশ্চয়ই জানো। Pal-

pitation হয় বুকের দোষে, না বুকের ভিতরে যে মন লুকোনো আছে, সেটি বিগড়ে গেলে? তুমি বলবে,—ও দুই কারণেই। সেই ঠিক কথা। দেহ ও মন ত পরস্পর নিঃসম্পর্কিত নয়। আর ঐ দুয়ে মিলে ত তুমিও মানুষ, আমিও মানুষ। এই স্পষ্ট কথাটা ভুললেই আমরা হয় আধ্যাত্মিক নয় দেহাত্মিক নয় দেহাত্মবাদী হয়ে উঠি। আমি অবশ্য দেহাত্মবাদী নই। মনের সঙ্গে দেহের পার্থক্য আমি জানি। কিন্তু ঠিক কোথায় দেহ শেষ হয় আর মন আরম্ভ হয়, তা জানিনে।

বীণার খেয়াল

এর পরই বীণা কথার মোড় ফিরিয়ে নিয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন—বৌঠানকে কি রকম দেখলে?

—স্বয়ং সিংহবাহিনী।

—সে ত স্পষ্ট। সুন্দরী?

—সে ত স্পষ্ট। ইংরাজিতে যাকে বলে queenly beauty। সেই রঙ, সেই কপাল, সেই নাক, সেই ঠোঁট, সেই চিবুক, সেই স্থির দৃষ্টি। এ ত আগাগোড়া দৃঢ়তা ও প্রভুত্বের স্বপ্রকাশ রূপ।

—আর সেই সঙ্গে দাসীত্বের। সিঁথের সিঁদুর কি তোমার নজরে পড়েনি? ও কিসের নিদর্শন?—দাসীত্বের;—সেই দাসীত্বের, যা স্ত্রীলোকে স্বেচ্ছায় বরণ করে।

আমি এ কথার প্রতিবাদ করতে উদ্যত হলে তিনি বাধা দিয়ে বললেন,—তোমার কথা শুনতে আমি আসিনি, এসেছি আমার

কথা তোমাকে শোনাতে। স্বামী অবশ্য দেবতা। সেই স্বামী যিনি হৃদয়ের গর্ভমন্দিরে স্ব প্রতিষ্ঠিত, আর যাঁর দেবদাসী হওয়া স্ত্রীধর্ম। দাসী কেউ কাউকে করতে পারে না। আমরা কখনো কখনো স্বেচ্ছাদাসী হই। যাক্ ও-সব কথা। ঐ সিঁথের সিঁদুর আমার চোখে বড় সুন্দর লাগে আর পরতে বড় লোভ হয়—অর্থাৎ এখন হচ্ছে। যাও আমার ঘরে, আয়নার টেবিলের ডানধারের দেরাজে সিঁদুরের কৌটা আছে—নিয়ে এস ; একবার পরে দেখবো আমাকে কত সুন্দর দেখায়।

আমি চেয়ার ছেড়ে ওঠবামাত্র বীণা বললেন—ক্ষেপেছ! আমি সিঁথেয় সিঁদুর পরব? আমি যে চিরকুমারী, যেমন তুমি চিরকুমার।—তুমি সিগারেট খাও?

—খাই

—ঐ আয়নার উপর এক টিন 555 আছে, নিয়ে এসো। আমি তোমার জন্য কিনে আনিয়েছি—চটুরাজকে দিয়ে। আমি বকে যাবো আর তুমি নীরবে সিগারেট ফুঁকবে।

বীণার প্রলাপ

আমি সিগারেটের টিন ঘর থেকে এনে পাশে রাখলুম। বীণা বললেন :—

আমি আজ প্রলাপ বকব, আর জানই ত প্রলাপের কোনও syntax নেই। সুতরাং আমার বকুনি হবে সাজানো কথা নয় —এলোমেলো কথা। সে বকুনি শুনে পাছে তুমি ঘুমিয়ে পড়ো।

সেই ভয়ে তোমার হাতে সিগারেট দিয়েছি। এ জলন্ত সিগারেট হাতে ধরে ঘুমিয়ে পড়তে পারবে না, অগ্নিকাণ্ড হবার ভয়ে।— এখন আমার প্রলাপ শোনো। আমার জীবন বিশৃঙ্খল কেন জানো? আমি কখনোও কারও দাসী হতে পারিনি—অর্থাৎ কাউকেও ভালবাসতে পারিনি। দাদাকে আমি অবশ্য প্রাণের চাইতেও ভালবাসি—তাঁর সঙ্গে আমি অভিন্নহৃদয়। কিন্তু এ ভালবাসা নৈসর্গিক ও অশরীরী। এ হচ্ছে এক বৃন্তে দুটি ফুলের সৌহার্দ্দ, যে সৌহার্দ্দের বন্ধন ফুলে ফুলে নয়, উভয় ফুলের সঙ্গে একই মূলের।

আর মাষ্টার মহাশয়?—তিনি শিখেছিলেন শুধু উচ্চাটনের মন্ত্র, তা ছাড়া আর কিছু নয়। Hypnotismএর ঘোর ক'দিন থাকে? তাঁর নীরস স্বভাবের ছোঁয়াচ লেগে আমি পাষাণ হয়ে গিয়েছিলুম। তারপর একটি পথ-চলতি লোকের সুকুমার স্পর্শেই অহল্যা আবার মানবী হয়ে উঠল। আমার শুষ্ক হৃদয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে ফুল ফুটল। কেবলমাত্র যূথী জাতি মল্লিকা মালতী নয়, অর্থাৎ যে-সব কুসুম পূজায় লাগে শুধু তাই নয়;—সেই সঙ্গে নব বসন্তের অগ্নিবর্ণ কিংশুক, হৃদয়ের অন্তঃপুরে আযৌবন অ[illegible] নবজীবনের সদ্যমুক্ত কামনার জবাকুসুম। এখন উপমার ও সংস্কৃতের আব্রু খুলে ফেলে বলি,—আমি তাকে প্রথম ভালবাসি ও প্রথম থেকেই।

এই বাঙলা কথাটা মুখে আনতে অপ্রবৃত্তি হয়। কেন না ওর চাইতে সস্তা কথাও আর নেই, অথচ ওর চাইতে দামী

কথাও আর নেই। সস্তা তার কাছে, যে ও-কথার অর্থ জানে না; আর যে জানে, তার কাছে অমূল্য। সে ব্যক্তি পরম সুন্দর —দেহে ও মনে। আর তার অন্তরে পশুর অস্তিত্ব নেই, আছে শুধু যাদুকরী বীণার তার। এ কথা আজ বলছি কেন জানো? —এই পারিবারিক বিভ্রাটের বিপ্লবের প্রচণ্ড ধাক্কায় আমি আজ জেগে উঠেছি, নিজেকে চিনতে পেরেছি। আজ আত্মগোপন করা হবে বৃথা মিথ্যাচার।

বীণার মুক্তি

এর পরে বীণা বললেন—"যাও ঘোষাল, আমার বীণাটি নিয়ে এসো—আর ওষুধের শিশিটাও। এখন আমার বুকের ভিতর হৃদয়টা তাণ্ডবনৃত্য করছে। যদি বীণার বশীকরণ মন্ত্রে নৃত্যকে বশীভূত করতে না পারি, তাহলে ওষুধ খেয়ে হৃদয়টা সায়েস্তা করব।" আমি বীণার ঘর থেকে ওষুধ ও বীণা দুই নিয়ে এলুম।

আমি ফিরে আসবামাত্র "শ্বসিত কম্পিত পীনঘনস্তনী" বীণা নিজের হৃদয়কে "শান্ত হ পাপ" এই আদেশ করে, আমাকে বললেন,—"তোমার মুখে একটি কথা শুনতে চাই; তারপর বীণা বাজাব, তারপর ওষুধ গলাধঃকরণ করব। এখন আমার জিজ্ঞাস্য এই,—যার মায়ায় তুমি উদভ্রান্ত ও উন্মার্গগামী হয়েছিলে, সে মায়াবিনী কি তোমাকে আমার চাইতেও বেশী মুগ্ধ করেছিল?— না, তা হতেই পারে না। আমার মোহিনী শক্তি আর কেউ না জানুক, তুমি ত জান।

এখন বীণাটি দেও। তোমাকে এই শেষ রাত্তিরে একটি আশাবরী শোনাব, যা আমার বীণার মুখে কখনো শোনো নি।"

এই বলে তিনি বীণাটি বুকে তুলে নিয়ে "নৈয়া ঝাঁঝরি" বীণার মুখ দিয়ে আমাকে শোনালেন। এ বাজনা শুনে রাধা কৃষ্ণের বাঁশী সম্বন্ধে যা বলেছিলেন, তাই আমার মনে পড়ল ;— "মনের আকুতি বেকত করিতে কত না সন্ধান জানে।" বাজানো শেষ হলে বীণা বললেন,—এই গানটি তোমার মুখে প্রথম শুনি, আর বীণার মুখে এই শেষ শুনলে। হৃদয়ের এই উদ্দাম তোলপাড় ওষুধে আর থামবে না ; আর যখন থামবে, একেবারেই থামবে। এই হচ্ছে আমার premonition। তুমি আমার পাণিগ্রহণ করে, I mean হাত ধরে, আমাকে সুমুখের চৌকাঠটা পার করে দেও।

আমি তার হাত ধরে শোবার ঘরের চৌকাঠটি পার করে দিলুম। বীণা ঘরে ঢুকেই বললে,—যতগুলো বাতি আছে সব জেলে দেও—আমার বড় ভয় করছে। সব বাতি জেলে আমি জিজ্ঞেস করলুম—কিসের ভয়? বীণা বললে—মৃত্যুভয়।

তারপর যেমন শোওয়া অমনি "বীণা হিনামা সমুদ্রোত্থিত রত্ন" অকূল সাগরে নিমগ্ন হল। "অন্তর্হিতা যদি ভবেন্নিতেতি মন্যে।" আর আমি জীবন নামক নৈয়া ঝাঁঝরিতে ভেসে বেড়াচ্ছি। যাদের ধন আছে মন নেই, সেই সব দোতলার জীবদের মোসাহেবী করছি। যারা আমোদ ও আনন্দের প্রভেদ জানে

না, সেই সব সমজদারদের মজ্‌লিসী গান শোনাচ্ছি, আর নিত্য-নতুন সত্যমিথ্যা গল্প বানিয়ে বলছি।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম—এ গল্প সত্য না মিথ্যা ?

ঘোষাল বললে—একসঙ্গে দুই।

—তার অর্থ ?

—তার অর্থ গল্প science নয় art।

শেষ



ভালো-মন্দ

বাংলার অপরাজেয় কথা-শিল্পী শ্রদ্ধেয় শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই উপন্যাসখানির সূচনা করিয়াছেন। বাংলার বিশিষ্ট সাহিত্যিকগণ ইহাকে রূপ দিয়াছেন। বইখানি বাংলা সাহিত্যে যে অমরত্ব লাভ করিবে তাহা বলাই বাহুল্য।